মাসুদ রানা

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

আবার ষড়যন্ত্র

www.Banglapdfboi.com

এই বইটি বাংলাপিডিএফবই এর সৌজন্যে নির্মিত। বইটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই এর একটি কপি আপনার নিকটতম বুকস্টল থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হল। লেখক কিংবা প্রকাশকের কোন প্রকার আর্থিক ক্ষতি আমাদের কাম্য নয়।

বাংলাপিডিএফবই ওয়াটারমার্ক বিহীন বই প্রকাশ করে থাকে। এই পদ্ধতি অবলম্বনের কারনে আমাদের ওয়েবসাইটটির প্রসারে ও প্রচারে বাধা আসছে। কাজেই সবার কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনি এই ওয়েবসাইটটি থেকে বই ডাউনলোড করে উপকৃত হলে, অবশ্যই আপনার পরিচিতজনদের কাছে আমাদের সাইটটি শেয়ার করবেন।

বাংলাপিডিএফবই কর্তৃপক্ষ

Coming Soon

আবার ষড়যন্ত্র

প্রথম প্রকাশ: ২০০২

এক

বিসিআই হেড অফিস। ঢাকা।

মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান দেশে নেই। জরুরী এক সেমিনারে যোগ দিতে সপ্তাখানেকের জন্যে লন্ডন গেছেন। তাই সবকিছুতেই ঢিলেঢালা ভাব। দেড় মাস পর দেশে ফিরে বুড়ো নেই দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল মাসুদ রানার। অবশ্য একটু পর নিজের অফিস রুমে পা রাখতেই সে ভাবটা দূর হয়ে গেল। খুশি হয়ে উঠল মনটা। মাস দেড়েক পর দেশে ফিরেছে, খুশির সেটা একটা কারণ, অন্যটা হচ্ছে ওর রুমের একদম ঝকঝকে, নতুন চেহারা।

ওর অনুপস্থিতিতে একদম নতুন করে সাজানো হয়েছে কামরাটা, পুরানোগুলো সব সরিয়ে নতুন আমদানী করা হয়েছে প্রতিটা ফার্নিচার। দেয়ালের রং, ডেস্ক-চেয়ার, কার্পেট, কার্টেন, ক্লোক স্ট্যান্ড, টেলিফোন, ইন্টারকম সেট, ফ্লাওয়ার ভাস, পেন স্ট্যান্ড, ডেস্ক ক্যালেন্ডার, অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডায়েরি, সীলিং ফ্যান, এয়ারকূলার, স-ব।

এমনকি এয়ারফ্রেশনারের গন্ধটাও নতুন। তার সাথে যোগ হয়েছে ভাসে সাজানো একগোছা তাজা ফুলের মিষ্টি গন্ধ। সব মিলিয়ে অফিসরুমটাকে নববধূর মত মোহনীয় লাগল ওর। সবচেয়ে বেশি যেটা চোখে পড়ল, সেটা হলো জিনিসগুলোর রঙ। প্রত্যেকটা ওর পছন্দের রঙ—হাল্‌কা, মিষ্টি।

ওকে অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মুখ টিপে হাসল ওর সুন্দরী পি.এ। বসের সম্মানে সে-ও আজ মনের মত করে সেজেছে। খুক্‌ করে কাশল সে পিছন থেকে। 'কেমন হয়েছে, রানা?'

'অপূর্ব! দারুণ! চমৎকার! সুন্দর! ফার্স্ট ক্লাস!' বলল ও।

হাসল মেয়েটা। 'বাব্বাহ্‌, এত কিছু?'

মাথা দোলাল রানা। 'আরও বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু একটা খুঁত রয়ে গেছে দেখে বললাম না।'

'খুঁত! কোথায়?'

'এই যে,' গম্ভীর হলো ও। 'এমন একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও মিস্‌ করেছে বুড়ো! তোমার মত এক শাঁকচুন্নীকে সেই যে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে রেখেছে...'

ফোঁস করে উঠল মেয়েটা। 'কি! আমি শাঁকচুন্নী? আর তুমি? তুমি তাহলে কি?'

'আমি?' নিরীহ ভঙ্গিতে শ্রাগ করল ও। 'কি আবার! যা ছিলাম তাই, মামদো...'

খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে উঠল পি.এ। সামলে নিয়ে বলল, 'যাক্‌, তাহলে পছন্দ হয়েছে।'

'তোমাকে? হ্যাঁ, সে তো কবেই।'

'ধ্যাৎ! আসতে না আসতেই শুরু হয়ে গেল?' দু'গালে লাল আভা ফুটল তার। দরজায় নকের শব্দে ওর সামনে থেকে পালিয়ে বাঁচল।

একমুহূর্ত পর ভেতরে পা রাখল সোহেল আহমেদ। সংস্থার চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ও, রানার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দু'কান পর্যন্ত বিস্তৃত হাসি নিয়ে এগিয়ে এসে এক হাতে রানাকে জড়িয়ে ধরল সে। 'কেমন আছিস, দোস্ত?'

ও-ও জড়িয়ে ধরল সোহেলকে। 'ভাল। তুই?'

'এই চলছে আর কি! বাহ্, তুই দেখছি অনেক হ্যান্ডসাম হয়ে উঠেছিস আগের চেয়ে!'

'ফুলচন্দন পড়ুক তোর মুখে। কিন্তু আর নজর দিস্‌নে। আয়, ক্যান্টিনে গিয়ে আড্ডা মারা যাক্ কিছুক্ষণ।'

'তারচেয়ে এখানেই বসি, আয়। তোকে দেখলেই ভিড় করে আসবে সবাই, কথা বলা যাবে না।'

মুখোমুখি বসল দু'বন্ধু। চেয়ার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, ব্যাক টিল্ট করে পরখ করল রানা। 'দারুণ! হঠাৎ এই পরিবর্তন কিজন্যে, দোস্ত?'

'কেন আবার! যমদূতের ইচ্ছে হলো, করিয়ে দিলাম,' সোহেল বলল।

'কি দেখে ইচ্ছে হলো?'

শ্রাগ করল ও। 'একদিন করার কিছু না পেয়ে অফিস মেইনটেন্যান্স ফাইল চেয়ে পাঠাল। দেখে-টেখে বলল, "রানার রুমটা গত তিন বছর একই রকম আছে, সব বদলে দাও। অফিস রুমে মাঝেমধ্যে চেঞ্জ দরকার। তাতে সবকিছু যেমন ফ্রেশ হয়, তেমন মনটাও ভাল থাকে।" ব্যস্, লাখ দেড়েক গেল খসে।'

চারদিকে তাকাল রানা। কৃতজ্ঞ বোধ করল রাহাত খানের প্রতি। খুঁটিনাটি কিছুই চোখ এড়ায় না তাঁর। 'কিন্তু এতসব আমার পছন্দের রঙের সাথে মিলিয়ে কে করল?' বিস্ময় ফুটল ওর চেহারায়।

'সে ক্রেডিটটা তুই তোর একমাত্র দুলাভাইকে দিতে পারিস,' গম্ভীর হয়ে বলল সোহেল। 'তোর বোনের কিছুই যেমন গোপন নেই আমার কাছে, তেমনি তোরও কিছু অজানা নেই।'

নীরবে হাসল রানা। 'থ্যাঙ্কস, দোস্ত। প্রথমটা না হলেও পরেরটা যে বর্ণে বর্ণে সত্যি, তার প্রমাণ হয়ে গেছে। তুই পাস। একজনের মধ্যে ফার্স্ট হয়েছিস।'

'ব্যস্, এতেই খালাস?' চোখ কোঁচকাল সোহেল। 'তোর জন্যে এত করলাম, বিনিময়ে এক কাপ কফি তো অন্তত পেতে পারি!'

'তা পারিস, কিন্তু বাঙালীর তো আবার স্বভাব খারাপ, বসতে পেলে শুতে চায়। সেরকম তুইও হয়তো কফির পর সিগারেট চেয়ে বসবি। ওটা কিন্তু দিতে পারব না। সিগারেট ছেড়ে দিয়েছি আমি।'

অকৃত্রিম বিস্ময়ে চোখ কপালে উঠল সোহেলের। 'সিগারেট ছেড়ে দিয়েছিস্? তুই?'

ও সিরিয়াস। 'হ্যাঁ, বিলকুল।'

'ঠিক আছে, ওটা না হয় গাঁটের পয়সায় কিনেই খাব। কফি তো খাওয়াবি!'

একটু পর কফি এলো, নতুন সেটে। কাপ রাখার ফাঁকে ওদের দু'জনের

চেহারা-সুরত ঠিকঠাক আছে কি না আড়চোখে দেখে নিল পি.এ. মেয়েটা, যুদ্ধ-বিগ্রহের কোন লক্ষণ নেই দেখে একটু অবাকই হলো। এই দুই শ্রীমান এক হয়েছে অথচ মারপিট হয়নি, ভাবাই যায় না। রীতিমত অকল্পনীয় ব্যাপার। সম্ভবত আজই ভাঙা হলো রেকর্ডটা।

মেয়েটা বেরিয়ে যেতে একটু একটু করে গম্ভীর হয়ে উঠল সোহেল, দুই চুমুক দিয়ে বলল, 'তোর সাথে জরুরী একটা কথা ছিল, রানা।'

সঙ্গে সঙ্গে সিরিয়াস হলো ও। 'অফিশিয়াল কিছু?'

'বুঝতে পারছি না। হতে পারে, না-ও হতে পারে। তবে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। বস্ নেই যখন, তোর পরামর্শ দরকার।'

'বল্, কি হয়েছে।'

'ইন্দিরা রোডে তোর এক বন্ধু থাকত না, মিতু? একাত্তরে তোর সঙ্গে একই সেক্টরে যুদ্ধ করেছিল?'

ভুরু কুঁচকে উঠল ওর। 'হ্যাঁ, কেন?'

'ওর ছোট একটা বোন আছে ইতি নামে। অনেক আগে একবার ওকে দেখেছিলাম।'

'দুই বোন ছিল আসলে। সাথী-ইতি। মিতু মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ায় ওদের পাড়ার শান্তি কমিটি হুমকি দিয়েছিল, তাই ভয়ে ভারতে পালিয়ে গিয়েছিল ওদের ফ্যামিলি। ওখানে শরণার্থী শিবিরে কলেরায় মারা যায় সাথী। ইতি তখন খুব ছোট ছিল। কিন্তু হঠাৎ ওদের কথা কেন?'

'বলছি। ওদের পরিবারের বর্তমান অবস্থা জানিস কিছু?'

'নাহ্,' মাথা নাড়ল রানা। 'সাতাশিতে মিতু লিভার ক্যান্সারে মারা যাওয়ার পর কয়েকবার গিয়েছিলাম ওদের বাড়িতে, তার পর আর যাওয়ার সময় হয়নি। মিতুর মারা যাওয়ার খবর পেয়ে তো তোকে নিয়েই গিয়েছিলাম।'

মাথা দোলাল সোহেল। 'সে-জন্যেই তো ইতিকে চিনতে পেরেছি।'

'ওর সাথে দেখা হয়েছে তোর? কোথায়?'

'উয়ারিতে।'

'খবর ভাল তো ওদের?' ঝুঁকে বসল ও।

'না। ভাল না।'

'খুলে বল্।'

'পাঁচদিন আগে,' নড়েচড়ে বসল সোহেল, 'উয়ারিতে দেখা হলো মেয়েটার সাথে। তার আগের তিনটে দিন আমাকে ফলো করছিল ও।'

'বলিস কি! কেন?'

'জরুরী কিছু বলার ছিল, তাই। কথাগুলো আসলে তোকেই বলতে চাইছিল ইতি।'

বিস্মিত হলো ও। 'এমন কি কথা...'

'ওর কাছে তোর দেয়া ন্যাশনাল ট্রেডিং এজেন্সির কার্ড ছিল। ওটার প্রত্যেকটা নাম্বারে তোর সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছে, কিন্তু নাম্বার চেঞ্জ হয়ে যাওয়ায় পারেনি।'

'আশ্চর্য! ফোন নাম্বার না হয় বদলেছে, অফিস তো আর বদলায়নি। সরাসরি চলে আসেনি কেন?'

'ভয়ে আসেনি। ওর ধারণা ওকে ফলো করা হচ্ছে।'

'মানে! কে ওকে ফলো করে?' বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়ছে রানার।

ভুরু কুঁচকে উঠল সোহেলের। 'আগে শুনে নে। পরপর তিনদিন অফিস ছুটির পর তোর দেখা পাওয়ার আশায় রাস্তার ওপারে অপেক্ষা করেছে ইতি, দুই-তিন ঘণ্টা করে। তোকে না পেয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করেছে, তাও তিনদিন। ধরতে পারেনি। অফিসের পর হয় ক্লাবে, নয়তো কোন পার্টিতে গিয়েছি আমি, সে সব জায়গায় দেখা করার সাহস পায়নি।'

'আচ্ছা!'

'সেদিন অফিস থেকে বেরিয়ে আগে একটা কাজে উয়ারি গিয়েছিলাম। কাজ সেরে ফিরব, গাড়িতে উঠেছি, এই সময় হঠাৎ কোত্থেকে এসে আমার পাশে উঠে বসল ও। বোরখা পরা। আমি তো আপদ ভেবে তক্ষুণি বের করে দিতে যাচ্ছিলাম, তখন তাড়াতাড়ি নিজের পরিচয় দিল ও।'

'এত রাখ-ঢাকের কারণ?' আরও ঝুঁকে বসল রানা।

'বনানীতে নামকরা এক প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করে ইতি, চীফ অ্যাকাউন্টেন্ট। বেতন ভালই পায় মনে হলো। ছয় বছর ধরে চাকরি করছে। কিন্তু কোম্পানির ইদানীংকার কিছু কিছু ব্যাপারে খুব সন্দেহ ঢুকেছে ওর মনে। ইতির সন্দেহ, ফার্মের মালিক দেশবিরোধী কোন কিছুর সাথে জড়িত। এসব নিয়ে ও তোর সাথে কথা বলতে চায়।'

চোখ বুজে কিছুক্ষণ ভাবল রানা। 'নাম কি ইতির বসের?'

'আলহাজ্জ মাওলানা মোহাম্মদ কেরামতুল্লাহ্!' প্রথম শব্দটা হলকুম থেকে উচ্চারণ করল সোহেল, বাকিটা রসিয়ে রসিয়ে। মানিব্যাগ থেকে একটা দামী ভিজিটিং কার্ড বের করে বাড়িয়ে দিল। 'ইতির কার্ড। তবে অফিসের নাম্বারে যোগাযোগ করা যাবে না। সমস্যা হতে পারে।'

ওটায় চোখ বোলাল রানা। লেখা আছেঃ তাসমিন সুলতানা, চীফ ইগজেকিউটিভ (অ্যাকাউন্টস), গ্লোবাল ইন্টারন্যাশনাল, নবম ফ্লোর, কে-কে ভবন, ৩৭৭৪/এ, কামাল আতাতুর্ক অ্যাভিনিউ, ঢাকা। কোম্পানির কাজের ধরন সম্পর্কে বলা আছেঃ এক্সপোর্টার্স, ইম্পোর্টার্স, কমিশন এজেন্টস ইত্যাদি। 'ওরা ভাল নেইঃ কেন বললি?'

'ওর বাবা সাত বছর থেকে পঙ্গু। প্যারালিসিস। বড় চাকরি করতেন, টাকা-পয়সাও কম পাননি অফিস থেকে। পেনশনও বিক্রি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এক ভাগ্নে ব্যবসা করার নামে প্রায় সব টাকা হাতিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেছে দেশ ছেড়ে। এখন বাড়ির একটা অংশ ভাড়া দিয়েছেন; ভাড়ার টাকা আর ইতির বেতনের টাকায় চলে সংসার।'

'হুঁম!'

'তোর গতকাল দেশে ফেরার কথা, ইতিকে তা জানিয়ে দিয়েছি আমি। ও আজ অপেক্ষায় থাকবে। কার্ডটার উল্টোদিকে একটা ফোন নাম্বার আছে; ওই

নাম্বারে ঠিক রাত আটটায় ফোন করলে ইতি ধরবে। ওর এক বান্ধবীর ফোন ওটা।'

আরেক দফা কফি খেয়ে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল সোহেল, ওর থেকে একটা নিয়ে যেন খেয়াল নেই, এমনভাবে ঠেলে দিল রানার দিকে। তুলে নিল ও প্যাকেটটা, খুলে তাজ্জব হয়ে গেল। একেবারে উনিশটা সিগারেট! চট্ করে সোহেলকে দেখে নিল, খেয়াল না করার ভান করল সোহেল। মনে মনে হাসল রানা, একটা ধরিয়ে বাকিগুলোসহ প্যাকেট ফিরিয়ে দিল।

চোখ বড় বড় করে তাকাল সোহেল। 'কি রে, শালা! তুই না সিগারেট ছেড়ে দিয়েছিস?'

'দিয়েছিলামই তো,' নির্বিকার চেহারায় বলল ও। 'কিন্তু তুই যে টেনশনের খবর শোনালি, তাতে আবার না ধরে পারলাম না।'

হো-হো করে হেসে উঠল সোহেল। 'কিন্তু, দোস্ত, আস্ত প্যাকেট হাতে পেয়েও ফিরিয়ে দেয়ার মত ভদ্র কবে থেকে হয়েছিস তুই, বল তো?'

'আগে তুই বল্, আস্ত প্যাকেট আমার হাতে তুলে দেয়ার মত বুকের পাটাই বা কবে হলো তোর?'

এবার একযোগে গলা ছেড়ে হেসে উঠল দুই বন্ধু। একটু পর উঠে পড়ল সোহেল।

দিনটা পত্র-পত্রিকা পড়ে আর এর-ওর রুমে হানা দিয়ে গল্প করে কাটাল রানা। বিকেলে একটু তাড়াতাড়ি বাসার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল। বেশ কিছুদিন বাইরে থাকার কারণে ব্যক্তিগত ছোটখাট বেশ অনেক কাজ জমে আছে, সেগুলো যতটা সম্ভব সেরে ফেলতে হবে। আবার যদি ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়, তাহলে সময় পাওয়া যাবে না।

ঠিক আটটায় নির্দিষ্ট নাম্বারে ফোন করল ও। একবার রিং হতেই সাড়া দিল ইতি। 'হ্যালো!'

'রানা!'

'ওহ্!' দম আটকে গেল মেয়েটার।

দু'চার কথায় কাজ সারল রানা। রিসিভার রেখে সিগারেটের প্যাকেটের জন্যে হাত বাড়াল। ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠেছে আপনিই। বুঝে ফেলেছে, ব্যাপারটা যা-ই হোক, হাল্কা নয়। মেয়েটাকে যথেষ্ট উত্তেজিত মনে হয়েছে গলা শুনে। এবং ভীতও।

ব্যাপারটা কি নিয়ে হতে পারে ভাবতে গিয়ে ব্যর্থ হলো রানা। অনেক কিছু নিয়েই হতে পারে, এই বলে নিজেকে অন্য কাজে ব্যস্ত রাখল। ভোরে উঠে বাগানের পরিচর্যা করতে হবে বলে শুয়ে পড়ল তাড়াতাড়ি।

পরদিন। রাত আটটা দশ।

সেগুনবাগিচার এক চাইনিজ রেস্টুরেন্ট। এ সময়ে এলাকাটা বেশ নিরিবিলি থাকে বলে ডিনারের জন্যে এদের এখানে টেবিল বুক করে রেখেছিল রানা। ও পৌঁছেছে ঠিক আটটায়, ইতি এলো মিনিট দশেক পরে।

বেশ কয়েক বছর পর দেখা, তবু ওকে চিনতে একটুও কষ্ট হলো না রানার। বাঙালী মেয়েদের তুলনায় একটু বেশিই লম্বা, পাঁচ ফুট পাঁচ। মুখটা সামান্য লম্বাটে, খাড়া নাক, বড় বড় চোখ। মণির রং কুচকুচে কালো। মাথায় ঘন, কালো চুল। আলোয় চিক্‌চিক্ করছে। সব মিলিয়ে ভারি মিষ্টি চেহারা।

সাধারণ সাদা সালোয়ার, প্রিন্টের চুড়িদার কোর্তা ও সাদা ওড়না পরে আছে ইতি। ওড়না দিয়ে নিজেকে যথাসম্ভব ঢেকে রেখেছে। বিন্দুমাত্র মেকআপ্ নেয়নি, তবু অসাধারণ লাগছে দেখতে। অন্য গ্রাহকদের চাপা কণ্ঠের আলোচনায় ছেদ পড়ল কিছু সময়ের জন্যে, ঘাড় ঘুরিয়ে একবার করে তাকাল সবাই।

ওয়েটার প্রস্তুত ছিল, ইতিকে রানার টেবিলে পৌঁছে দিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ডিনার সার্ভ করতে। অন্যদের ছেদ পড়া আলোচনা আবার শুরু হলো। খাওয়ার ফাঁকে টুকটাক ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কথা বলল ওরা। আসল প্রসঙ্গ উঠল পরে, ওয়েটার টেবিল পরিষ্কার করে সফট্ ড্রিঙ্ক দিয়ে যেতে।

'এবার বলো ব্যাপার কি,' রানা বলল।

নিচু গলায় প্রায় ত্রিশ মিনিট ধরে থেমে থেমে কথা বলে গেল ইতি, ওর বলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত একটি কথাও বলল না রানা। চুপ করে শুনল শুধু। তারপর প্রশ্ন করতে লাগল একের পর এক। 'কেরামতুল্লাহ্ আর কুদরতুল্লাহ্ই কে-কে ভবনের মালিক?'

'জ্বি। কেরামতুল্লাহ্ কোম্পানির চেয়ারম্যান।'

'তাহলে অন্য যার কথা বললে, প্রভাবশালী, সে কে?'

'তা জানি না, তবে আমাদের কোম্পানি যে বেশকিছু ব্যাপারে তার ওপর নির্ভরশীল, তা জানি।'

'তার নাম শোনোনি বা কখনও তাকে দেখোওনি?'

ওড়না টেনেটুনে ঢাকা শরীর আরও ভাল করে ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করল মেয়েটা। 'জ্বি, না। কখনও দেখিনি। শুনেছি তিনি নাকি নামকরা একজন বিজ্ঞানী, অথচ নামটা যে কি, জানি না। অফিসে কখনোই তাঁর নাম উচ্চারণ করা হয় না। চেয়ারম্যানকে মাঝেমধ্যে অন্য এক "কে-কে" সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছি। খুব সম্ভব সেই লোকই আসল।

'বিদেশে থাকেন তিনি। আমি যদ্দুর জানি গত তিন বছরে পাঁচবার বাংলাদেশে এসেছেন। অফিসে আসেননি অবশ্য। আমার সন্দেহ ঢাকাতেই আসেননি, আর কোথাও ছিলেন। তিনি এলে কেরামতুল্লাহ্ও একনাগাড়ে বেশ কিছুদিন অফিস কামাই করেন। এরকম যতবার হয়েছে, ততবারই খেয়াল করেছি ভদ্রলোকের গায়ের রং আগের তুলনায় বেশ কালো হয়ে গেছে। শুনেছি পানি বদল হলে এরকম হয়। বিশেষ করে মিষ্টি পানি ছেড়ে লবণাক্ত পানির এলাকায় কিছুদিন থেকে এলে।'

মন্তব্যটা অর্থপূর্ণ, তাই ইতির দিকে তাকাল রানা। 'আর ভাতার ব্যাপারে কি বলছিলে?'

'মাসের পাঁচ তারিখে আমাদের বেতন দেয়া হয়। প্রত্যেক মাসে বাইরে থেকে নতুন নতুন লোক ভাতা নিতে আসে সেদিন। তারা প্রত্যেকে মোটামুটি

শিক্ষিত, ষোলো থেকে পঁচিশের মধ্যে বয়স। বিনয়ী, ভদ্র। কিন্তু আমার মনে হয় ওসব মেকী। ওরা এলে ভয়ে ভয়ে থাকি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টাকা দিয়ে বিদায় করি। তবে ওদের কেউ কখনও খারাপ ব্যবহার করেনি, এটাও ঠিক। তবু ভয় লাগে।'

'কতজন করে আসে?'

'তার ঠিক নেই। কোন মাসে বিশ-ত্রিশজন আসে, কোন মাসে পঞ্চাশ-ষাটজন। সবচে' বেশি এসেছিল গত বছরের এপ্রিলে, দেড়শোজন। একবার যারা আসে, পরেরবার তাদেরকে আর দেখি না।'

'কত করে দেয়া হয়?'

'আড়াই হাজার,' বলল ইতি।

'বলো কি! এত ভাতা কি জন্যে দেয়া হয়? কি কাজ করে ওরা?'

'তাও জানি না। গোপনে খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পেরেছি দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করা হয় তাদেরকে। মাসের শেষদিকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। টঙ্গিতে মাওলানার একটা বড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্লট আছে, সেখানে থাকে। তারপর পাঁচ তারিখে এসে ভাতা নিয়ে চলে যায়।'

'মানে প্রত্যেককে একবার করে ভাতা দেয়া হয়?' বলল রানা।

'না না! প্রতি মাসেই দেয়া হয়।'

'এই না বললে ওরা কেউ দ্বিতীয়বার আসে না?'

'না এলে কি? প্রত্যেকের টাকা মাসের এক তারিখে মানি অর্ডার করে যার-যার গ্রামের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়া হয় বাবা বা মা-র নামে, যাতে পাঁচ তারিখের মধ্যে পেয়ে যায় তারা।'

'তার মানে এরা ঢাকা থেকে গ্রামে ফিরে যায় না,' একটু চিন্তা করে বলল রানা। 'গেলে টাকা তাদের নামেই পাঠানো হত।'

'জ্বি। আমারও তাই মনে হয়।'

'এ মাসে ভাতা খাতে কত টাকা ডেবিট করেছ?'

'চৌষট্টি লাখ বিশ হাজার,' বলল ইতি। 'গত মাসেও তাই।'

চোখ সামান্য বিস্ফারিত হয়ে উঠল রানার। ঠোঁট গোল করে শ্বাস টানল। 'বলো কি! হিসেবে ভুল হয়নি তো তোমার?'

মাথা নাড়ল ইতি। 'না। দু'হাজার পাঁচশো আটষট্টিকে আড়াই হাজার দিয়ে গুণ করুন না, তাহলেই দেখতে পাবেন কত হয়।'

'ভাতাখোর তাহলে এত লোক?'

'জ্বি। আমি অবশ্য কেবল ঢাকার অফিসের কথাই বলছি।'

'ঢাকার বাইরে আরও অফিস আছে কেরামতুল্লাহর?'

'সাতটার কথা জানি। প্রত্যেক বড় শহরে একটা করে।'

'ডকুমেন্ট রাখা হয় এসব পেমেন্টের?'

'ঠিক জানি না, রানা ভাই। প্রথমবার লূজ ভাউচারে ভাতা দেয়া হয়। পরে ওগুলো আমার কাছ থেকে নিয়ে নেন মাওলানা কেরামতুল্লাহ্, আর ফেরত দেন না। তার পরের সব পেমেন্ট হয় মানি অর্ডারে। সেগুলোর কাউন্টার পার্টও নিয়ে

নেন তিনি। নিয়ে কি করেন, কোথায় রাখেন, জানি না। অফিসে যে রাখেন না, তা জানি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল রানা। কি যেন ভাবছে। 'ইতি, তুমি তোমার অফিসের যে পরিবেশের কথা বললে, তাতে সবখানে যাওয়ার বা সবার সাথে খোলামেলা আলোচনা করার সুযোগ তোমার তেমন একটা নেই বলেই মনে হয়েছে আমার।'

'ঠিকই বলেছেন, রানা ভাই।'

'তাহলে কেরামতুল্লাহর টঙ্গির প্লটের কথা, ঢাকায় এসে ওই লোকগুলোর ওখানে থাকার কথা, এসব তুমি জানলে কি করে? কখনও গিয়েছ ওখানে?'

ক্ষণিকের জন্যে দু'গাল রাঙা হয়ে উঠল মেয়েটার। টেবিলের কোনা খুঁটতে লাগল। 'জ্বি না।' একই প্রশ্ন দ্বিতীয়বার না করলেও ও যে জবাবের অপেক্ষায় আছে, তা বুঝতে পেরে একটু পর মুখ তুলল। 'আমি যা-যা বলেছি, সব সত্যি, রানা ভাই। একটাও মিথ্যে নেই। আপনি খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন।'

'ভুল বুঝেছ। তোমাকে সন্দেহ করিনি আমি। আমি কেবল জানতে চেয়েছি তোমার সোর্সটা কি, বা কে?'

জবাব নেই।

'ভেতরের কেউ একজন জানিয়েছে?'

'জ্বি।'

'ঠিক আছে। প্লটের লোকেশন বলো,' ইঙ্গিতে ওর সামনে পড়ে থাকা সফট্ ড্রিঙ্কের গ্লাস দেখাল রানা। 'খেয়ে নাও।'

একটু বিরতি দিল ও। গ্লাসে দুই চুমুক দিয়ে পার্স থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে দিল ইতি। 'এটা প্লটের ঠিকানা।'

ওটায় এক পলক নজর বুলিয়ে পকেটে রেখে দিল রানা। 'তোমাদের কোন কিছু ম্যানুফ্যাকচারিঙের ব্যাপার-স্যাপার আছে?'

'জ্বি-না।'

'এই প্লটে তাহলে কি হয়? আছে কি ওখানে?'

'স্কুলঘরের মত দুটো ঘর আছে। আর একটা গ্যারেজও আছে। পুরনো গাড়ি-টাড়ি থাকে শুনেছি।'

'প্লটটা কবে কেনা হয়েছে, জানো?'

'পঁচানব্বইতে। আমি চাকরিতে ঢোকার কিছুদিন পরে।'

ছোট ছোট চুমুকে পানীয়টুকু শেষ করল ইতি, আরেক দফা ওড়না টানাটানি শুরু করল। তাই দেখে রানা বলল, 'তোমার কি অস্বস্তি লাগছে?'

অবাক হয়ে তাকাল মেয়েটা। 'না! অস্বস্তি লাগবে কেন?' বলেই ওর প্রশ্নটার কারণ বুঝল। পলকের জন্যে লাল হলো গাল। 'মানে, অনেকদিন ধরে বোরখা পরে অভ্যেস তো, তাই...'

'আজ পরলে না কেন?'

'পরেছি। মানে পরেছিলাম, এখানে ঢোকার আগে ট্যাক্সি-ক্যাবে খুলে রেখে এসেছি। যাওয়ার সময় পরে নেব।'

'খুললে কেন?'

'সবাই আমাকে বোরখায় দেখে অভ্যস্ত, হঠাৎ এরকম খোলামেলা চলতে দেখলে হয়তো চিনতে ভুল করবে, সেই ভরসায় খুলে রেখেছি।'

'তার মানে তুমি শিওর তোমাকে ফলো করা হয়?'

'কখনও কখনও হয়, বুঝতে পারি। কোম্পানির সব ক'জন ইগজেকিউটিভ অফিসারকেই ফলো করা হয়।'

'কারণ কি?'

'মাওলানা কেরামতুল্লাহ্ কাউকে বিশ্বাস করেন না। কোন কোন ক্ষেত্রে এমনকি নিজের ভাইকেও না। সবাইকে সন্দেহ করা তাঁর একটা বাতিক। আমরা অফিস থেকে কোথায় যাই, ছুটির দিন কি করি, কোলিগদের কে কার বাসায় যায়, বা বাইরের কে কে তাদের কার কার বাসায় যায়, প্রায় সব খবরই রাখেন তিনি। এসব নিয়ে হঠাৎ হঠাৎ একে-ওকে প্রশ্ন করে বসেন। কাউকে চমকে উঠতে দেখলে মজা পান। সবাইকে বুঝিয়ে দেন, তিনি আমাদের সমস্ত খবরই রাখেন।'

ডালমে বহোত কুছ কালা হ্যায়, মনে মনে বলল রানা। কেরামতউল্লাহ্‌র কেরামতীর ক্ষেত্রটা কি? কারা এরা? দেশের বিরুদ্ধে কোনও অশুভ খেলায় মেতেছে লোকটা?

'মাসে তোমাদের আয় হয় কিরকম, সাদা পথে?'

'আমার জানামতে ঢাকার অফিসে ষাট-সত্তর লাখের মত।'

'লোকটা কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত?'

মাথা নাড়ল ইতি। 'হতে পারে। প্রায়ই ইসলামী লেবাস পরা লোকদের মীটিং হয় কে-কে ভবনে। দামী গাড়ি চড়ে আসেন অনেকে। তবে সঠিক খবর আমি জানি না।'

'এটা তো ঠিক, দু'মাসে কেবল ভাতাই দিয়েছ তোমরা সোয়া কোটি টাকার ওপর? বেশ, বেশ! তোমাদের কেরামতুল্লাহ্ ভালই কেরামতী জানে দেখছি। এ টাকাগুলো তাহলে কোন অ্যাকাউন্ট থেকে আসে?'

চোখ কোঁচকাল ইতি। মাথা নাড়ল। 'বলতে পারব না। মাসের পয়লা পুরো টাকা ক্যাশ নিয়ে আসেন কেরামতুল্লাহ্।'

'কোন্ ব্যাঙ্ক থেকে? একটা-দুটো বাণ্ডিলে নিশ্চই ব্যাঙ্কের সীল মারা থাকে, দেখোনি কখনও?'

'দেখেছি।' একটা প্রাইভেট ব্যাঙ্কের নাম বলল ও। 'ওদের দিলকুশা ব্রাঞ্চের সীল দেখেছি।'

আবার ঠোঁট গোল করে শিস দেয়ার ভঙ্গিতে নিঃশব্দে শ্বাস টানল রানা। এরকম একটা খবর পুলিসকে না জানিয়ে ইতি যে ওকেই বলবে ভেবে চেপে রেখেছিল, সেজন্যে মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাল সৃষ্টিকর্তাকে। পুলিসকে জানালে ফল বরং উল্টো হওয়ারই আশঙ্কা ছিল। তদন্তের নাম করে মাওলানার কাছ থেকে মোটা টাকা ঘুষ খেয়ে শেষ পর্যন্ত হয়তো মেয়েটাকেই হয়রানি করত। অথবা তেড়িবেড়ি দেখলে ওকে মাওলানার হাতে তুলেই দিত হয়তো, কে জানে!

'সবই বুঝলাম,' বলল রানা। 'কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝলাম না।'

মুখ তুলল মেয়েটা। 'কিসের কথা বলছেন?'

'বিখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা, বীর প্রতীক মিতুর বোন এদের সাথে ভিড়ল কিভাবে?' প্রশ্নটা করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রানা।

'সে অনেক কথা, রানা ভাই। আমি জানি শুনতে ভাল লাগবে না আপনার। কেবল একটা কথা জেনে রাখুন, ভিড়তে বাধ্য হয়েছিলাম আমি।'

'না হয় লাগলই খারাপ, তুমি বলো। সংক্ষেপে।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কি যেন ভাবল মেয়েটা। মনে মনে কথা গুছিয়ে নিল বোধহয়। 'ঢাকা ভার্সিটিতে ভর্তি হতে গিয়ে খুব সমস্যায় পড়ে গিয়েছিলাম। মামা, খালুর জোর ছিল না বলে টেস্টে ভাল রেজাল্ট করেও কোটা সমসার কারণে প্রায় আউটই হয়ে যাচ্ছিলাম। বহু জায়গায় ধরনা দিয়েও কারও সাহায্য পাইনি, তখন এক ছাত্রনেতা সেধে সাহায্য করেছিল আমাকে।

'কেরামতুল্লাহ্‌র বেশ প্রিয়পাত্র ছিল সে। আজ আমি যে ভাল একটা চাকরি করছি, সেটাও তার জন্যেই সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া বাবা যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন, আমার এক ফুপাতো ভাই বাবার সমস্ত টাকা-পয়সা নিয়ে পালিয়ে গেল, সেই ভীষণ বিপদের সময়ও এই ছেলেই আমাদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই বাধ্য হয়ে...'

'দারুণ ছেলে তো! কি নাম?'

'কাজল।'

'কাজল!' ভুরু কুঁচকে উঠল ওর। 'নামটা চেনা চেনা লাগছে! এই ছেলেকেই না...'

'জ্বি। ছ'মাস আগে মেরে ফেলা হয়েছে ওকে।'

'খবরটা পত্রিকায় পড়েছিলাম আমি।' জিভ দিয়ে আফসোস প্রকাশ করল। 'ভারী দুঃখজনক।'

আবার কিছুক্ষণ নীরবে কাটল। ঘড়ির কাঁটা সাড়ে দশটার ঘর ছাড়িয়ে যাচ্ছে দেখে নড়ে বসল রানা। 'তোমাদের বিল্ডিঙের সিকিউরিটি ব্যবস্থা কেমন?'

'খুবই কড়া। এত কঠোর ব্যবস্থা দেশের আর কোন প্রাইভেট বিল্ডিঙে আছে বলে মনে হয় না।'

'খুলে বলো।'

রুমাল বের করে ঠোঁটের দুই কোণ মুছল মেয়েটা। নিচু গলায় শুরু করল, 'আট, নয় আর দশ, এই তিনটে ফ্লোর গ্লোবাল ইন্টারন্যাশনালের। চেয়ারম্যানসহ আমরা সিনিয়র অফিশিয়ালরা দশতলায় বসি। আট তলার গেটে পরিচয়পত্র দেখাতে হয়...'

'এই যে নতুন নতুন মানুষ তোমাদের অফিসে আসে, টাকা নিয়ে যায়, এদের নামের তালিকা করা হয় না?' বলল রানা।

একটু যেন চমকে উঠল ইতি। 'তাই তো! এ প্রশ্ন তো কখনও মনে জাগেনি আমার! নিশ্চয়ই হয়, নইলে টাকা যায় কোন ঠিকানায়?'

'চেক করে দেখা সম্ভব তোমার পক্ষে?'

'হ্যাঁ। মাস্টার কম্পিউটারে অফিশিয়াল সমস্ত ইনফর্মেশন থাকে।

অ্যাকাউন্টসের প্রয়োজনে আমিও অপারেট করি ওটা। ওরকম কিছু যদি থাকে, তাহলে ওটাতেই থাকবে।'

'গুড!' খুশি হলো রানা। 'যত তাড়াতাড়ি হয় চেক্ করো ব্যাপারটা। যদি থাকে, তালিকা কপি করে নিয়ে এসো। তার সাথে অ্যাকাউন্টসের একটা স্টেটমেন্টও আনবে।'

দ্রুত মাথা দোলাল ইতি। 'জ্বি। চেষ্টা করব।'

'কিন্তু সাবধানে। হুড়োহুড়ি করে কিছু করতে যেয়ো না। যা করার, ধীরেসুস্থে করবে, খুব সাবধানে। কাজ সারতে যদি কয়েকদিন দেরিও হয়, অসুবিধে নেই। হোক দেরি, কিন্তু কেউ যাতে কিছু সন্দেহ করতে না পারে, সেদিকে সতর্ক থাকবে।'

'বলতে হবে না। আমি সাবধান থাকব।'

মৃদু হাসল রানা। 'এ পর্যন্ত যা দেখালে, তাতে আমারও মনে হয় না তোমাকে সতর্ক করার দরকার আছে। তবু বললাম।'

ওকে একটা ফোন নম্বর দিল রানা। 'এটা মুখস্থ করে নাও। বিশেষ পরিস্থিতি দেখা দিলেই এটায় ফোন করবে। সে যখনই হোক।' নিচু গলায় আরও কিছুক্ষণ কথা বলে ঘড়ি দেখল রানা–প্রায় এগারোটা বাজে।' ওয়েটারকে বিল দিতে বলে ইতির দিকে ফিরল। 'আর কিছু?'

'জ্বি-না।'

'তুমি চাইলে আমি তোমাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি।'

'না, না! আমি ট্যাক্সিতেই যেতে পারব।'

'একটু বোসো তাহলে,' উঠে পড়ল ও। 'আমি বাইরে একটু চোখ বুলিয়ে আসছি।'

বেরিয়ে এসে রেস্টুরেন্টের মেইন গেটের বাইরে ফুটপাথে দাঁড়াল ও, সিগারেট ধরাবার ফাঁকে রাস্তার ওপারে চোখ বোলাল। তারপর ডানে-বাঁয়ে। নাহ্, সন্দেহজনক কাউকে দেখা গেল না। এমনিতেই নিরিবিলি জায়গা এটা, রাত বাড়ার ফলে আরও নির্জন হয়ে গেছে। ওর ডানদিকে একটা সস্তা রেস্টুরেন্ট, ঘড়ঘড় করে ওটার শাটার নেমে এলো–বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

পিছনে, চিটাগাং হোটেলে যাওয়ার পথে বাঁ দিকে একটা গাড়ি মেরামতের কারখানা। তার সামনে বসে আছে কিশোর বয়সী দুই হবু মেকানিক, গল্প করছে। সন্দেহ করার মত আর কাউকে দেখল না রানা।

সিগারেট ফেলে হিলের চাপে পিষে দিল ও, রেস্টুরেন্টে ঢুকে গেল নিশ্চিন্ত মনে।

দুই

কে-কে ভবন, বনানী। কয়েকদিন পরের কথা।

দশতলায় ওয়েলফার্নিশড্ বিরাট, আলিশান অফিসরুমে পুরু গদিমোড়া সুইভেল চেয়ারে বসে আছে আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ কেরামতুল্লাহ্। চিন্তায় মগ্ন। মানুষটা মাঝারি উচ্চতার, ষাটের মত হবে বয়স। কিন্তু দেখলে অত মনে হয় না। কিছু মানুষের বেলায় এমনটা ঘটে থাকে, মনে হয় না তাদের বয়স বাড়ে। মনে হয় যেন এক জায়গায় থেমে আছে ওটা, নড়তে চড়তে ভুলে গেছে। সমসাময়িকরা তাদের দেখে গোপনে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, ঈর্ষায় ভোগে।

কেরামতুল্লাহ্র ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে, চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের বেশি বয়স হয়েছে মনেই হয় না। চৌকো মুখ। থুতনিতে এক মুঠো কাঁচাপাকা দাড়ি, জুলফির মত আরও কিছু আছে দু'গালে, তবে থুত্নিরগুলোর সাথে সম্পর্কবিহীন। চোখ দুটো একটু ছোট। মণির রং না কালো, না বাদামী। সাপের মত ঠাণ্ডা চাউনি তার, দেখলে যে-কারও বুক কেঁপে উঠবে। মানুষের চাউনি যে এত ভয়ঙ্কররকম শীতল হতে পারে, ভাবাই যায় না। এরকম নজির পৃথিবীতে আর আছে কিনা, বলা কঠিন।

দেহের মাঝখানটা একটু ঠেলে বেরিয়ে আছে তার, ওটা ভুঁড়ি, ইদানীং গজিয়েছে। এছাড়া এমনিতে হাল্কা-পাতলা গড়নের মানুষ সে। প্রাণশক্তিতে ভরপুর। হ্যাঁ, এই জিনিসের অভাব তার কোনকালেই ছিল না, আজও নেই। এছাড়া আরেকটা গুণ আছে তার। সেটা হলো সুযোগ খুঁজে বের করা। সব পরিবেশ, সব পরিস্থিতিতেই নিজের জন্যে সুযোগ খুঁজে বের করতে মহা ওস্তাদ লোক এই কেরামতুল্লাহ।

এ ক্ষমতা তার জন্মসূত্রে পাওয়া। অনেকে আছে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। কিন্তু কেরামতুল্লাহ মানুষটা অন্য ধাতের, সুযোগ সে তৈরি করে নেয়। সব সময় ঝোপ বুঝে মারে কোপ।

'৭১-এ যখন স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলো, সুযোগটা চিনতে ভুল করেনি সে। ছিল গ্রামের এক মসজিদের মৌলবি, ছোট ভাইকে নিয়ে 'দেশরক্ষা'র লড়াইয়ে যোগ দিল পাকিস্তানের কিছু দালালের সহযোগিতায়। কুখ্যাত এক বাহিনীর সদস্য হয়ে অস্ত্র সংগ্রহ করল, তারপর গা ঢাকা দিল দু'জন মিলে। 'দেশরক্ষা'র কথা ভুলে স্রেফ ডাকাতি শুরু করে দিল আশপাশের এলাকায়, কুষ্টিয়ার মেহেরপুর অঞ্চলে।

ভুঁড়িতে হাত বোলাল কেরামতুল্লাহ। সামনের নক্সা করা রুপোর ট্রে থেকে এক খিলি খশবুদার পান মুখে পুরে আয়েস করে চিবুতে লাগল। সে বহু বছর আগের কথা। তারপর গড়াই নদী দিয়ে অনেক পানি গড়িয়েছে, ইতিহাস হয়ে গেছে সব। পলি পড়ে পড়ে কয়েক হাত নিচে চাপা পড়ে গেছে সেদিনের

'কেরামইত্যা'র কথা। ভুলে গেছে সবাই।

খুব কম লোকই জানে সেদিনের সেই কেরামইত্যাই আজ সমাজের খুব উঁচু স্তরের মানুষ, আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ কেরামতুল্লাহ। টাকা-পয়সার কোন অভাব নেই তার। একাত্তরে দু'ভাই নিজেদের অমুক 'দেশরক্ষা' বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে ডাকাতি করে প্রচুর টাকা, সোনাদানা হাতিয়েছিল। তাদের অত্যাচারের শিকার হয় বাঙালী পরিবারগুলো, বিশেষ করে 'মালাউন'রা।

দেশ তথাকথিত 'স্বাধীন' হওয়ার পর এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়েছিল তাদেরকে। না গিয়ে উপায় ছিল না। মেহেরপুর সহ আশেপাশের সবখানে তাদের নামে পোস্টার বের হয়েছিল। তথাকথিত 'মুক্তিযোদ্ধা'রা ছাপিয়েছিল সেই পোস্টার। লেখা ছিল: এই দুই দালাল ডাকাতকে ধরিয়ে দিন।

ডাকাত! ঘৃণার সাথে ভাবল কেরামতুল্লাহ্, বাঁ হাতে পায়ের কাছ থেকে ওগোলদানটা (পিক্‌দানী) তুলে পিচিক্ করে পানের রস ফেলল। সে তো বড়জোর শ'খানেক বেঈমান, কওম ও ওয়াতানের শত্রুকে খতম করেছে। তা-ও আবার বেশিরভাগই বিধর্মী, কাফের। অথচ তাদেরকে যারা ডাকাত বলে প্রচার করত, তারা কি করেছে? মুক্তিযুদ্ধের নামে, স্বাধীনতার নামে নিজেদের হালুয়া রুটির ভাগ পোক্ত করেনি তারা? আলবৎ করেছে।

কেউ অস্বীকার করতে পারবে? যুদ্ধের নামে গ্রামে গ্রামে গিয়ে এর-ওর বাড়িতে থেকেছে তারা, অক্ষমদেরকেও বাধ্য করেছে তাদের জন্যে ভাল-ভাল খানার ব্যবস্থা করতে। কোনও বাড়িতে সুন্দরী যুবতী দেখলে তখনই না হোক, দেশ 'তথাকথিত স্বাধীন' হওয়ার পর ফিরে এসে তাকে দখল করে খায়েশ মিটিয়েছে। ডাকাতি করেছে, বহু হিন্দুর সম্পত্তি গ্রাস করেছে, তাদের মেয়েদের সর্বনাশ করেছে। গ্রাম্য দলাদলির সুযোগ নিয়ে একপক্ষের টাকা খেয়ে অন্য পক্ষকে 'দালাল' আখ্যা দিয়ে প্রকাশ্যে পৈশাচিক উপায়ে খুন করেছে। ধন-সম্পদের পাহাড় গড়েছে।

এরকম ভূরি ভূরি ঘটনার কথা জানা আছে কেরামতুল্লাহ্‌র। সেই সমস্ত 'মহান মুক্তিযোদ্ধারা' আজ বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়, টাকার জোর আছে বলে সবার কাছে খাতির-যত্ন পায়। তাদের বিচার কে করবে? কেউ নেই সেরকম। থাকবেও না, কারণ সবাই তেলা মাথায় তেল দিতেই অভ্যস্ত।

কি অদ্ভুত কাণ্ড! ফারাক্কায় বাঁধ দিয়ে শুকনোর সময় এ দেশকে মরুভূমি করে ছাড়ে প্রতিবেশী দাদারা, প্রতিবাদ নেই। বর্ষাকালে কৃত্রিম বন্যা সৃষ্টি করে চুবিয়ে মারে, তবু 'হেঁ-হেঁ' করে সরকার, 'সব ঠিক আছে' বলে সাফাই গায় নির্লজ্জের মত। কেউ যদি এসব নিয়ে হক কথা বলতে যায়, অমনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধীর সীল মেরে দেয়া হয় তার গায়ে। আর যে তেল মারে, চোখ বুজে সমস্ত অন্যায় দেখেও না দেখার ভান করে, সে হয়ে ওঠে মুক্তিযুদ্ধের তথাকথিত স্বপক্ষের শক্তি—কী অদ্ভুত যুক্তি!

এভাবে কতদিন চলতে পারে একটা দেশ? ত্রিশ বছর তো হয়ে গেল, আর কত ? অনন্তকাল নয় নিশ্চয়ই? সবকিছুরই একটা সীমা থাকা উচিত। নইলে চলে না। কেরামতুল্লাহ্ এখন সেই সীমারেখা টানতে যাচ্ছে। অনেক হয়েছে, আর না।

নতুন করে দেশসেবার ব্রত নিয়েছে সে। পাকিস্তানী ছিল, পাকিস্তানী আছে, এবং পাকিস্তানীই থাকবে সে। এদেশের আর সব ইসলাম-ভক্তদের মত কোনদিন মেনে নিতে পারবে না সে স্বাধীন বাংলাদেশ। ওদের মত মোনাফেকি করতে পারবে না সে পাকিস্তানের সঙ্গে। ক্ষমতার ভাগ পাওয়ার জন্য ওরা এখন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে পশ্চিম থেকে পুবে। এমন কি মেনে নিয়েছে নারী নেতৃত্বও, ক্ষমতার লোভে জলাঞ্জলী দিয়েছে ইসলামকেও।

দাঁড়াও! খুব শীঘ্রি নতুন একটা কিছু ঘটাতে চলেছে সে। এদের কারও সাহায্য লাগবে না তার: কয়েক হাজার খাদেম সে-জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, আরও হচ্ছে কয়েক হাজার। শেষের দলটা প্রস্তুত হলেই শুরু হয়ে যাবে খেলা। এই লোকগুলোকে সংগ্রহ করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে তাকে। দিকে দিকে একান্ত বিশ্বস্ত এজেন্ট পাঠিয়ে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত, ধর্মভীরু, আপোশহীন মুসলিম খুঁজে বের করতে হয়েছে প্রথমে, তারপর আরেকদল এজেন্ট পাঠিয়ে তাদের প্রত্যেকের ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ খোঁজ-খবর নিতে হয়েছে।

তারপর বাছাই। বিশেষ করে যারা বেশি অভাবী, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পুরোপুরি হতাশ, তাদেরকে অগ্রাধিকার দিয়েছে মাওলানা কেরামতুল্লাহ্। এরমধ্যে যাদের বিরুদ্ধে ছোটখাট ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে, তাদেরকে তো আরও।

নগদ টাকার টোপ ফেলা হয়েছে উপযুক্ত 'খাদেম' সংগ্রহের খাতিরে। রাজি হলেই যেখানে বৈষয়িক ভবিষ্যৎ নিশ্চিত, সেখানে গররাজি হবে কোন মূর্খ? তারওপর 'ইসলামের খেদমত' করা, ও দেশে আবার পাকিস্তানের সুশাসন কায়েমে সহায়তা করা, এবং সবচেয়ে বড় কথা ভবিষ্যতে ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হতে পারার মত এমন সুবর্ণ সুযোগ, এতসব একসঙ্গে ক'জনের ভাগ্যে জোটে? কাজেই খাদেমের অভাব হয়নি। নতুন একটা দল গড়েছে সে। সমভাবাপন্ন কিছু লোক নিয়ে শুরু করে এখন দাঁড়িয়ে গেছে রীতিমত শক্তিশালী একটা রাজনৈতিক দল।

এসবে টাকা গেছে স্রোতের মত, কিন্তু তাতে কি? টাকা কোন সমস্যা নয় কেরামতুল্লাহ্র। ড্রাগসের কল্যাণে টাকার কোন অভাব তার নেই। তাই দরাজ-দিলে খরচ করেছে। কারণ প্রকল্পটা তার, ফসলও সে নিজের গোলাতেই তুলবে। কোন সমস্যা নেই।

কোনও এক সময় যে কেরামতুল্লাহ্ ও তার ভাই রাজধানী থেকে বহুদূরের কোনও এলাকায় ডাকাতি করেছে, আজ কেউ তা জানে না। সে সব ত্রিশ বছরের পুরানো কথা। প্রায় আড়াই যুগ আগের কাহিনী। মাটি চাপা পড়েছে সব।

এর মধ্যে ক্রমাগত পলি জমে গড়াই নদী যেমন দিনে দিনে শীর্ণ হয়েছে, মানুষের মনে তেমনি তাদের সম্পর্কে জমে থাকা স্মৃতির ওপরও বিস্মৃতির প্রলেপ পড়ে সব হেজেমজে গেছে। অনেক হাত মাটির তলায় চাপা পড়ে গেছে সে ইতিহাস।

নিজের 'আদর্শে' চলে সে। নিজেই নিজের নেতা, সংগঠনের নীতি-নির্ধারক। যদিও বেশ কিছু ঠুঁটো জগন্নাথ বসিয়ে রেখেছে সে দলের শীর্ষ পদে, গলা ধাক্কা দিলেই যখন-তখন তাদের বের করে দেয়া যাবে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় 'কাফের'দের টাকা-পয়সা, অলঙ্কার ইত্যাদি বেশ ভালই জমা হয়েছিল তার ভাণ্ডারে। '৭১-এর ডিসেম্বরে অলঙ্কার সব মাটির নিচে পুঁতে রেখে টাকাগুলো নিয়ে পালিয়ে সোজা লন্ডনে গিয়ে উঠেছিল সে ভাইকে নিয়ে। সেখানে প্লাস্টিক সার্জারি করিয়ে নিজেদের চেহারা আমূল বদলে ফেলে, এরপর পঁচাত্তরের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর ফিরে আসে দেশে। সোনাদানা সব বিক্রি করে শুরু করে চিনি ও গুঁড়ো দুধ আমদানীর ব্যবসা। দুটোরই তখন চড়া বাজার, ফলে আশির দশকের মধ্যে কোটি কোটি টাকার মালিক বনে যায় দু'ভাই। তারপর হাত দেয় ড্রাগসের লোভনীয় কারবারে। এখন সত্যিকার অর্থেই তার কাছে 'মানি ইজ নো প্রব্লেম!'

দু'ভাই আসলে কথার কথা, সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ কেরামতুল্লাহ্‌র একার হাতেই ছিল। এখনও আছে। ভাই শুধু মাসোহারা পায়।

এ মুহূর্তে তাদের যে টাকা-পয়সা আছে, তার পরিমাণ কেরামতুল্লাহ্ নিজেও সঠিক জানে কি না সন্দেহ। উদার হাতে টাকা খরচ করে সে, ভবিষ্যতেও করবে, তার ধ্যান-ধারণা বাস্তবায়িত করতে হলে টাকা তো লাগবেই। মোট কথা, এই দেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে যা-যা চাই, সবকিছুই করবে সে। শুধু তাই নয়, কাফেরদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের হাত শক্ত করতে আবার পূর্ব আর পশ্চিমকে সে এক করবে। এই জন্যেই শক্তি সঞ্চয় করছে সে, 'খাদেম' রিক্রুট করছে দেশের সবখান থেকে। যারা ধর্মের ব্যাপারে অন্ধ, পাকিস্তানের ভক্ত, বেছে বেছে তাদেরকেই সংগ্রহ করে সে। তাদেরকে কোরান শরীফ স্পর্শ করে শপথ করিয়ে নেয়।

তারপর শুরু হয় 'সবক' পর্ব। কে-কে ভবনের নবমতলায় এ উপলক্ষে রুদ্ধদার বৈঠক বসে, শপথ গ্রহণের মাধ্যমে শুরু হয় তা। এদেরকে মাসে মাসে সংসার খরচ হিসেবে যৎসামান্য 'ভাতা' দিয়ে যাচ্ছে কেরামতুল্লাহ। ওদের বলা হয়েছে আসল প্রাপ্য পাবে ওরা মকসুদ হাসিলের পর।

'সবক' শেষ হলে তাদের ট্রেনিঙের জন্যে পাঠিয়ে দেয়া হয় অন্যত্র। সেখানে একটি বন্ধু দেশের কয়েকজন এক্সপার্ট সব ধরনের স্মল থেকে হেভি আর্মস চালানো ও বোমা তৈরির কৌশল শেখায় তাদেরকে। গেরিলা যুদ্ধের কলা-কৌশলও। এসবের সাথে ধর্ম ও প্রতিটি সাচ্চা মুসলমানের 'দায়িত্ব ও কর্তব্য' সম্পর্কেও জ্ঞান দেয়া হয় তাদের।

এরমধ্যে প্রথম তিন ব্যাচের মোট সাড়ে-সাত হাজারের মত খাদেমের ট্রেনিং শেষ, ঘাঁটি ছেড়ে বের হওয়ার অপেক্ষায় আছে তারা। শেষ দলের ট্রেনিং চলছে। প্রথম তিন দলের কাজ নিজের চোখে দেখে এসেছে কেরামতুল্লাহ্। মাত্র কয়েক মাসে এতটাই বদলে গেছে তারা, এতই জেহাদী মনোভাব এসে গেছে তাদের মধ্যে যে, চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছে তার। এখন ক্ষমতার নেশায় বুঁদ হতে বাধা নেই মাওলানার। প্ল্যান-প্রোগ্রাম সব তৈরি, জানে, তার মঞ্জিল বেশি দূরে নেই। তবে...

পথে একটা কাঁটা আছে—বেশ শক্ত কাঁটা। পার্টির চেয়ারম্যান বা অন্যান্যদের নিয়ে কোন চিন্তা নেই, হাতের মুঠোতেই আছে ওরা। ঠিক সময়মত ব্যবস্থা নিতে

অসুবিধে হবে না। কিন্তু বছর তিনেক আগে কোত্থেকে একজন কে-কে এসে চেপে বসে গেছে তার কাঁধে, সে-ও দলে আসতে চায়, তারও ক্ষমতার ভাগ চাই। পাগল আর কাকে বলে! এ যেন আল্লাহরওয়াস্তের মাল, চাইলেই পাওয়া যায়। তার প্রস্তাবে রাজি না হয়ে উপায় ছিল না তার। পার্টি মীটিং ডেকে সবার মতামত নিয়েই অবশ্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে। তবে তার ঘোর সন্দেহ, শেষপর্যন্ত লোকটা 'ভাগে' সন্তুষ্ট হবে না। তার দৃঢ় বিশ্বাস, শেষ সময়ে আচমকা কিছু একটা ঘটিয়ে একাই সব দখল করার মতলব আছে ব্যাটার। তা থাক, মতলব তার নিজেরও আছে। তাকে সামাল দিতে সে-ও প্রস্তুত।

কিন্তু সমস্যা হলো যে, লোকটাকে এক কথায় হাঁকিয়ে দেয়ার ক্ষমতা নেই কেরামতুল্লাহ্‌র, এত সন্দেহ-অবিশ্বাস সত্ত্বেও সহ্য করে যেতে হচ্ছে। দলে লোকটার প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়ছে দিন দিন। ইচ্ছে থাকলেও তাকে ঘাড়ধাক্কা দিতে পারছে না সে, অন্তত এখনই নয়। টেকনিক্যাল সমস্যা আছে।

এ মুহূর্তে ক্ষমতা থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে আছে সে, এরকম জটিল একটা সময়ে সেরকম কিছু করার ঝুঁকি নিতে সে রাজি নয়। অন্তর্কলহের সৃষ্টি হলে সর্বনাশ ঘটে যাবে। তীরে এসে ডুববে তরী।

যতক্ষণ না 'তার' নিজস্ব 'খাদেমরা' আসল কাজে নামছে, অন্তর্ঘাতমূলক বিভিন্ন তৎপরতার মাধ্যমে অস্থির দেশটাকে আরও অস্থির করে তুলতে পারছে, চূড়ান্ত পরিণতির একেবারে কিনারায় পৌঁছে দিয়ে তাকে শেষ চাল দেয়ার সুযোগ তৈরি করে দিতে পারছে, ততক্ষণ লোকটাকে সহ্য করে যেতেই হবে। এবং তাতে যে বড় ধরনের কোন লোকসান হয়ে যাবে, তা-ও কিন্তু নয়। বরং অনেক লাভই হবে নিজের।

কারণ যে মানুষটা ক্ষমতার ভাগ দাবি করছে, সে যে-সে লোক নয়। একজন মস্তবড় বিজ্ঞানী। যদিও বিদেশে থাকে, কিন্তু বাঙালীরই সন্তান। তার পুরো নাম এখনও জানতে পারেনি কেরামতুল্লাহ্। বলে না সে কাউকে। নিজেকে শুধু 'কে-কে' বলে পরিচয় দিয়েছে।

প্রথমবার নামটা শুনে তো মাওলানা থ'। বিশ্বাসই হতে চায়নি। বলে কি! দুই কে-র সাথে এসে জুটেছে আরও এক কে-কে? এ কোন্ ধরনের দৈব-সংযোগ! অবাক কাণ্ড তো! এ কি আল্লাহ্ পাকেরই ইশারা?

বেশি কিছু জানতে পারেনি সে লোকটা সম্বন্ধে, জানার তেমন জোরাল চেষ্টাও করেনি। দরকারটাই বা কি? তার হচ্ছে কাজ নিয়ে কথা। ওটা হলেই হলো।

এমনই এক অত্যাধুনিক অস্ত্র আবিষ্কার করেছে কে-কে, যেটা সে কেন, পশ্চিমা অস্ত্র নির্মাতারা পর্যন্ত কল্পনাও করতে পারবে না। আবিষ্কার তো অনেক পরের কথা।

কে-কে আদর করে ওটার নাম দিয়েছে ইএমপি গান, অর্থাৎ ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক পালস্ গান। প্রথমে বিশ্বাস না করলেও মাওলানা কেরামতুল্লাহ্ এখন জানে, বিশ্বের সর্বাধুনিক অ্যাসল্ট রাইফেল ওটা। দেখতে প্রায় সাধারণ অ্যাসল্ট রাইফেলের মতই, তবে একটু ভারী। সবচেয়ে শক্ত ধাতু টাঙস্টেনের তৈরি ওটার বুলেট, দেখতে অনেকটা নস্যির কৌটোর মত, ভোঁতা মাথা। শব্দ

প্রায় করেই না, কিন্তু ছোটে অসম্ভব দ্রুত গতিতে। সেইসঙ্গে পেনিট্রেশনের ক্ষমতাও অবিশ্বাস্য।

একথা বিশ্বাস করত না সে নিজের চোখে না দেখলে।

টেলিফোনেই প্রথম যোগাযোগ। লোকটার দুই-একটা কথা শুনেই তাকে নিজের অফিসে দাওয়াত করে এনেছিল সে। তারপর ছানাবড়া হয়ে গিয়েছিল মাওলানার চোখ, যখন অপরিচিত একজন লোকের মুখে ওর গোপন প্ল্যান-প্রোগ্রামের নিখুঁত বর্ণনা শুনল। কিছুটা আশ্বস্ত হলো, যখন মৃদু হেসে লোকটা বলল, 'ঘাবড়াবেন না, মাওলানা, আমি আপনার ক্ষতি করতে আসিনি। বরং উপকার করতে চাই।'

'কেন, জনাব?'

'ক্ষমতার ভাগ চাই। খুব বেশি না, দশভাগের একভাগ।'

'কেন তা আপনাকে দেয়া হবে, হুজুর? নিশ্চয়ই উপযুক্ত কারণ আছে আপনার কাছে?'

'তা আছে,' বলল কে-কে। 'আমি আপনাকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করব।'

'আমি সাহায্য চাই তা আপনাকে কে বলল, হাযরাত?'

'কেউ বলেনি। আমিই বলছি। আর আসলেও আপনার সাহায্য দরকার। আমার সাহায্য পেলে আপনার কাজটা পানির মত সহজ হয়ে যাবে। আপনার ক্যাডারদের প্রত্যেকের হাতে যদি আমার দেয়া একটা করে ইএমপি গান থাকে, ইচ্ছে করলে শুধু এই দেশ নয়, আশপাশের কয়েকটা দেশও হেসে-খেলে দখল করে নিতে পারবেন।'

এতক্ষণে নিষ্প্রাণ চওড়া হাসি ফুটল কেরামতুল্লাহ্‌র মুখে। বুঝে ফেলেছে, পাগলের পাল্লায় পড়েছে। কিন্তু আবার দ্বিধা এলো মনে—পাগলই যদি হবে, আমার প্রতিটা পদক্ষেপের হুবহু বর্ণনা দিল কি করে?

একদৃষ্টে চেয়ে দেখছিল কে-কে ওর মুখে ভাবের পরিবর্তন। এবার সে-ও হাসল। বলল, 'ঠিক দুই মিনিটের মধ্যে আপনার সব সন্দেহ ঘুচিয়ে দিচ্ছি, মাওলানা সাহেব। ওই তোতাটা আপনার?' ঘরের কোণে খাঁচায় ঝোলানো সবুজ পাখিটা দেখিয়ে জানতে চাইল হঠাৎ।

'জ্বি, হাঁ। কেন?'

'আমার অস্ত্রের কার্যকারিতা দেখাতে চাই আপনাকে। ওটা মারা পড়লে মস্ত কোনও ক্ষতি হবে না তো আপনার?'

'না। তবে ঠিক বুঝতে পারলাম না আপনি কি বলতে চাইছেন, জনাব।'

'পিওনটাকে ডাকুন, বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

বেল বাজাতেই লম্বা সালাম দিয়ে এসে দাঁড়াল পিওন।

'ওকে বলুন, পাখিটাকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে আমার চোখের আড়ালে যে-কোনও জায়গায় ঝুলিয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসুক।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ইশারা করল কেরামতুল্লাহ, খাঁচাসহ পাখি নিয়ে বেরিয়ে গেল পিওন। 'এইবার?'

'এইবার বলুন, মাওলানা, পাখিটাকে কি দেখতে পাচ্ছেন?'

'উঁহুঁ।'

'আমি দেখতে পাচ্ছি?'

'না।'

এতক্ষণে ব্রিফকেস খুলে বিদঘুটে চেহারার ছোট্ট একটা অস্ত্র বের করল কে-কে। হাঁ করে চেয়ে রইল কেরামতুল্লাহ ওটার দিকে। এমন জিনিস জীবনে দেখেনি সে।

'এটা ছোট্ট একটা সংস্করণ,' বলল কে-কে। 'নমুনা হিসেবে রেখেছি সঙ্গে। একে বলে ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক পালস গান। সংক্ষেপে ইএমপি গান। এর কার্যকারিতা দেখুন নিজের চোখে। আসলে আমি যেগুলো আপনাকে দেব সেগুলো একেকটা প্রমাণ সাইজ অ্যাসল্ট রাইফেলের সমান, যদিও ওর চেয়ে একটু ভারি।' অস্ত্রটা দেয়ালের দিকে তাক করল কে-কে। 'এখনও বলুন, পাখিটার জন্যে মনে কোনও আফসোস হবে না তো আপনার?'

'আপনি বলতে চাইছেন, এখানে বসেই পাশের ঘরের তোতা পাখিটাকে আপনি মারতে পারবেন?'

'নিজের চোখেই দেখুন পারি কি না,' বলে পিস্তলের মত করে অস্ত্রটা ধরে ট্রিগারে চাপ দিল সে। ঠুক করে আওয়াজ হলো দেয়ালে, পরমুহূর্তে 'চ্যাঁ' করে মরণ চিৎকার দিল তোতাটা। কোনও কথা না বলে, মাথা ঝাঁকিয়ে মুচকি একটু হাসল কে-কে। অস্ত্রটা তুলে রাখছে ব্রিফকেসে।

একলাফে চেয়ার ছাড়ল কেরামতুল্লাহ, দৌড়ে চলে গেল পাশের ঘরে। একটু পরেই খাঁচাটা নিয়ে ফিরে এলো নিজের কামরায়। কাত হয়ে পড়ে আছে পাখিটা খাঁচার ভেতর।

'দেখুন আবার অভিনয় করছে কি না! সত্যিই মরেছে তো?'

'কি করে সম্ভব হলো এটা, জনাব?' কেরামতুল্লাহ চোখে এখন বিস্ময়ের পাশে ঠাঁই নিয়েছে নিরঙ্কুশ শ্রদ্ধা। ঘাড় ফিরিয়ে দেয়ালের ফুটোটা দেখল একবার, তারপর দৃষ্টি ফেরাল নবাগত অতিথির দিকে। ঝড় বইতে শুরু করেছে তার মাথায়। কারণ, পাশের ঘরের ওদিকের দেয়ালটাও ফুটো করে বেরিয়ে গেছে বুলেট।

ইএমপি গানের আসল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ওর টেলিস্কোপিক সাইট। সময়মত গাঢ় সবুজ আলো বের হয় ওটা থেকে। টর্চলাইটের ফোকাসের মত, তবে উজ্জ্বল নয়, চাপা। এক্স-রের মত কাজ করে সে রশ্মি, পাঁচ বা দশ ইঞ্চি ইঁটের দেয়াল ভেদ করে ভেতরে ঢুকে যায়। পালস্ ঠিক কোথায় আছে, খুঁজে বের করে মুহূর্তে। এবার কেবল ট্রিগারটা টিপে দেয়া। দেয়াল ফুঁড়ে টার্গেটে গিয়ে বেঁধে গুলি। সেইদিনই গোপন মীটিং ডেকে দলের গুরুত্বপূর্ণ চার নেতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে সে কে-কের। অস্ত্রের কেরামতি দেখে পান খাওয়া লাল দাঁত বেরিয়ে গেছে পাকিস্তান প্রেমিকদের।

রীতিমত অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয় এক অ্যাচিভমেন্ট এটা কে-কের। দশ হাজার রাইফেল দিয়ে তাদের কাজে সাহায্য করার প্রস্তাব দিয়েছিল সে কেরামতুল্লাহ্‌কে।

কৃতজ্ঞতার সাথে রাজি হয়ে গিয়েছে কেরামতুল্লাহ্, রাজি না হওয়ার কোন কারণই ছিল না। ঠিক প্রয়োজনের সময় ওই জিনিস হাতে পেলে 'তার' খাদেমরা রাতারাতি ভেলকিবাজি দেখিয়ে দিতে পারবে।

সেজন্যেই চুপ করে আছে সে। একবাক্যে রাজি হয়ে গেছে ওর প্রস্তাবে। সময় হোক, হাতে আসুক রাইফেলগুলো, তারপর কে-কেও দেখতে পাবে কত ধানে কত চাল। কিভাবে কি করবে, সে সম্পর্কে গত তিনটে বছর পরিকল্পনা তৈরি করার সুযোগ পেয়েছে মাওলানা, উপযুক্ত সময় হলেই টের পাবে সবাই।

লোকটা বিদেশে থাকলেও তার সঙ্গে সারাক্ষণ যোগাযোগ রেখে চলে কেরামতউল্লাহ্, নতুন কিছু করার আগে তার পরামর্শ নেয়। কখনও কোন সমস্যা ঘটলে তাকে যাতে সে এককভাবে দায়ী করতে না পারে, সে জন্যেই এই ব্যবস্থা। হাসি পেল মাওলানার। 'আসল ঘটনা' যখন সত্যিই ঘটবে, তখন কাউকে দায়ী করার জন্যে হাজির থাকবে না লোকটা।

জোশের সঙ্গে আরও একবার পিক্ ফেলল মাওলানা, নতুন একটা খিলি মুখে পুরে উঠে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়াল। পুরু, টিনটেড কাঁচের ভেতর দিয়ে নিচের ব্যস্ত অ্যাভিনিউর দিকে তাকিয়ে থাকল অন্যমনস্ক দৃষ্টি মেলে।

বাস, মিনিবাস, প্রাইভেট কার, ট্যাক্সি ক্যাব গিজগিজ করছে ওখানে। আর মানুষ! পিঁপড়ের মত পিল্‌পিল্ করছে। ওফ্, এত মানুষ এই শহরে, ব্যস্ত এলাকায় ধাক্কা এড়িয়ে হাঁটাই যায় না। এই হারে মানুষ বাড়তে থাকলে আর দশটা বছর পর কি হবে অবস্থা? প্রতিদিনই জনসংখ্যা বাড়ছে ঢাকার। বাইরে থেকে পেটের ধান্ধায় আসছে তো আসছেই মানুষ। দেশের···

চোখের কোণে একটা নড়াচড়া ধরা পড়তে রাস্তার ডান দিকে তাকাল কেরামতুল্লাহ্। বেশকিছু মানুষ হৈ-হৈ করে ছুটছে একটা মিনিবাসের পিছনে। ব্যাপার বোঝার জন্যে আরেকটু ঝুঁকে দাঁড়াল সে। দেখতে পেল একটা বেবি ট্যাক্সি পড়ে আছে পথের মাঝখানে, সেটাকেও ঘিরে রেখেছে মানুষ। নিশ্চয়ই ওটাকে ধাক্কা দিয়ে এসেছে মিনিবাসটা। কিন্তু ধরা গেল না, বিপদ বুঝে বেপরোয়া গতিতে ভাগছে মিনিবাস। দেখতে দেখতে বড় রাস্তায় উঠে পড়ল, হাঁ-হাঁ করে ছুটে গেল মহাখালির দিকে। পিছনে ধাওয়াকারী জনতার অক্ষম আস্ফালনের রকম দেখে হাসি পেল তার।

ফিরে এসে বসে পড়ল, চিবুকের দাড়িতে হাত বুলাতে লাগল ঘন ঘন। আবার তলিয়ে গেছে কে-কের চিন্তায়। এই ইএমপি গানগুলো লোকটা তৈরি করেছে ইউরোপে। খুচরা যন্ত্রাংশ হিসেবে দেশে আনা হয়েছে ওগুলো, এ মুহূর্তে চট্টগ্রাম বন্দরে খালাসের অপেক্ষায় আছে সে-সব। গত পরশু পৌঁছেছে। এখন আস্তানায় নিয়ে গিয়ে অ্যাসেম্বলিং এবং তারপর···

অবশ্য ওই মালের গোটা চারেক এ মুহূর্তে তার জিম্মায় আছে, অস্ত্রটা কেমন কাজ করে দেখানোর জন্যে বছর দুয়েক আগেই নিয়ে এসেছিল কে-কে। সবগুলো হাতে আসুক একবার, তারপর বিজ্ঞানীর ব্যবস্থা করবে কেরামতুল্লাহ্। সাহায্যকারীকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করার ইচ্ছে তার ছিল না, কিন্তু ক্ষমতার প্রশ্ন যেখানে, সেখানে কূটকৌশল না খাটালে চলবে না। নইলে বঞ্চিত হতে হবে

ওর নিজেকেই।

আল্লাহ্ পরম করুণাময়, অসীম দয়াশীল। দুই পাকিস্তান এক হয়ে শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের ক্ষেত্রে এরকম কয়েক হাজার কোরবানিকে নিশ্চয়ই ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন তিনি, আর অপরাধ হলে নিশ্চয়ই তিনি মাফ করে দেবেন।

সময় হয়ে এসেছে, এখন চালে সামান্যতম ভুলও যাতে না হয়, কড়া নজর রাখতে হবে সেদিকে। কারও কোনরকম ভুল বা গাফিলতি সহ্য করা হবে না। কাউকে বিশ্বাস করা চলবে না, এমনকি আপন ভাইকে পর্যন্ত না।

বন্ধ দরজায় অস্থির করাঘাতের শব্দে চিন্তায় বাধা পড়ল মাওলানা কেরামতুল্লাহর। 'আসুন!' বলল সে গলা চড়িয়ে।

পরক্ষণে দড়াম করে দরজা খুলে গেল, ঝড়ের বেগে ভেতরে ঢুকল ছোটখাট এক লোক। কপালের ডান পাশ বিশ্রীভাবে ফুলে আছে তার, রক্তের একটা ধারা গড়িয়ে নামছে সেখান থেকে।

'হুজুর! হুজুর!' চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, হাঁপাচ্ছে। 'সর্বনাশ হয়ে গেছে, হুজুর!'

তড়াক্ করে উঠে দাঁড়াল কেরামতুল্লাহ্। 'কি! কি হয়েছে?'

'হুজুর, ওই মেয়েটা···মেয়েটা···'

'কোন্ মেয়েটা!'

'ওই যে, তাসমিন! সর্বনাশ হয়ে গেছে, হুজুর। মেইন কম্পিউটারের একটা ফাইল কপি করে নিয়ে গেছে! কোন্টা জানি না।'

মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার দশা হলো মাওলানার। 'কি বললেন!'

'জ্বি, হুজুর!' সশব্দে ঢোক গিলল লোকটা। 'আমি হঠাৎ করে ওই রূমে গিয়ে দেখি কপি চলছে। আমাকে দেখে একটা পেপারওয়েট মেরে কপালে···এই দেখুন, ও···'

এত কথা শোনার সময় নেই মাওলানার। হুঙ্কার ছেড়ে উঠল, 'খামোশ! মেয়েটা কোথায়?'

'পা-প্পালিয়ে গেছে, হুজুর। জ্ঞান ফিরে এলে আমি নিচের গার্ডদের ইন্টারকমে বলেছিলাম ওকে ঠেকাতে। কিন্তু ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে। ট্যাক্সি রেডি ছিল!'

খাম্বার মত দাঁড়িয়ে থাকল মাওলানা। যেন পায়ে শিকড় গজিয়ে আটকে ফেলেছে তাকে মেঝের সঙ্গে। কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।

তিন

বিসিআইয়ের সেফ হাউস। নিউ ডিওএইচএস, মহাখালি।

বাড়িটা দোতলা, এক ব্রাঞ্চ রোডের মাথায় প্রায় তিন বিঘা জমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে প্রচুর বড় বড় গাছ। সব মিলিয়ে বেশ নিরিবিলি। পিছনে

চওড়া ঝিল, কানায় কানায় ভরে আছে পানিতে।

আট ফুট উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা বাড়িটা, রিইনফোর্সড্ কংক্রিটের দেয়াল। তার ওপরে তিন ফুট উঁচু কাঁটাতারের মজবুত বেড়া। প্রয়োজনের সময় হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ চলাচল করে ওর মধ্যে দিয়ে। অনেকদিন পর আজ সে প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এ ছাড়া মেইন গেটে দুই সশস্ত্র গার্ড সদাসতর্ক, প্রস্তুত।

সবেমাত্র সন্ধে হয়েছে। দোতলার এক সুসজ্জিত রুমে বসে আছে ইতি, গালে হাত রেখে ভাবছে। ঘড়ি দেখছে একটু পর পর। রানার অপেক্ষায় আছে। চেহারার ফ্যাকাসে ভাবটা এখনও পুরোপুরি কাটেনি। ভীষণ ভয় পেয়েছে ও আজ, এত ভয় জীবনে পায়নি কখনও। খুব অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে ও, ধরা পড়লে সর্বনাশের বাকি থাকত না কিছু আর।

ভুল হয়ে গেছে, ভাবছে ইতি, মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। আরও সতর্ক থাকা উচিত ছিল। অবশ্য যতটা প্রয়োজন, তারচেয়ে কয়েকগুণ বেশিই সতর্ক ছিল ও, কিন্তু দুর্ভাগ্য। একেই বলে, যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধে হয়।

ছুটি হওয়ার আধ ঘণ্টা পর অফিস একদম ফাঁকা দেখে স্ট্রংরুমে গিয়েছিল ইতি। ভেবেছে দু'মিনিটে কাজ সেরে বেরিয়ে আসবে, কেউ কিছু টের পাবে না। কিন্তু ওই ব্যাটা চীফ পারচেজ অফিসার, রজব আলি, ওই লোক যে এমন খাড়া গজবের মত চশমার খোঁজে মাঝপথ থেকে ফিরে আসবে, তা কে ভাবতে পেরেছিল?

ইতি ঢোকার ঘণ্টাখানেক আগে স্ট্রংরুম থেকে রোজকার রুটিন কাজ সেরে বেরিয়েছে লোকটা, ভেতরে চশমাটা ফেলে গিয়েছিল। ইতি দেখেছে ওটা, কিন্তু গা করেনি। ভেবেছে ততক্ষণে নিশ্চয়ই বাসায় পৌঁছে গেছে রজব আলি, শুধু চশমার জন্যে ফিরে আসার কোন সম্ভাবনা নেই তার। কিন্তু···শিউরে উঠল ইতি, ভাগ্যিস হাতের কাছে পেপারওয়েটটা ছিল, সময়মত ওটা দিয়ে মেরে রজব আলিকে অচল করে দেয়া সম্ভব হয়েছিল। নইলে···।

উঠে দাঁড়াল ও, আরেকবার ঘড়ি দেখল–সোয়া সাতটা। খুব অস্থির লাগছে। গ্লোবাল ইন্টারন্যাশনালের লোভনীয় চাকরি খতম, কিন্তু তা নিয়ে দুঃখ নেই। ও ভাবছে পঙ্গু বাবা আর মার কথা। প্রয়োজন দেখা দিলে মাওলানা কেরামতুল্লাহ্‌র প্রতিহিংসার হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করবে কথা দিয়েছিল রানা। তার কতদূর হলো কে জানে।

পালাবার সময় ক্যাবে বসে মোবাইল ফোনে রানার দেয়া বিশেষ এক নম্বরে ফোন করে ইতি। ওর শিখিয়ে দেয়া ছোট্ট একটা সাঙ্কেতিক বার্তা জানিয়ে দেয় রিসিভারকে। তাতে কি কাজ হয়েছে? অবশ্যই হয়েছে, ভাবল ইতি। রানা ভাই যখন কথা দিয়েছেন, তখন কিছু না কিছু ব্যবস্থা এতক্ষণে নেয়া না হয়েই পারে না। এদিকে সে-ও এখানে নিরাপদ, কাজেই···

কিন্তু মাওলানা কেরামতুল্লাহ্‌র কূট বুদ্ধি ও তার সুযোগ্য চীফ ইগ্‌জেকিউশনার খাদেম শমশের আলির কর্মতৎপরতা সম্পর্কে যদি সামান্যতম ধারণাও থাকত, নিশ্চিন্ত নয়, বরং দুশ্চিন্তায় পাগল হয়ে উঠত ও। আতঙ্কে থর-হরি-কম্প হত।

ওয়েটারের সাদা, কড়া ইস্তিরি করা ড্রেস পরা এক বৃদ্ধকে দেখে চিন্তার সুতো

ছিঁড়ে গেল ইতির। 'আপনি কিছু খাবেন, ম্যাডাম?' প্রশ্ন করল সে।

বুঝতে পারল না ও। 'কি?'

'যা খুশি। নাস্তা, চা বা কফি, কোল্ড ড্রিঙ্কস।'

'এক কাপ চা দিন শুধু।'

লোকটা চলে যেতে পাশের রুমে গিয়ে ঢুকল ইতি। এটা স্টাডি। বেশ বড়, তিন দেয়ালজোড়া শেলফে প্রচুর বই সাজানো আছে। এক কোণে একটা পিসি আছে দেখে থমকে দাঁড়াল ও। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল ওটার দিকে। তারপর দ্রুতপায়ে পাশের ঘর থেকে পার্সটা নিয়ে এসে বসে পড়ল সেটটার সামনে। চকচকে একটা কম্প্যাক্ট ডিস্ক বের করে আনমনে উল্টেপাল্টে দেখল। গ্লোবালের মাস্টার কম্পিউটারের বিশেষ একটা ফাইল কপি করে এনেছে সে ওটায়।

দু'হাজার পাঁচশো আটষট্টিজনের নাম তো আছেই, সারা দেশে শ..ও যত খাদেম আছে তাদের নাম ও পুরো ঠিকানাসহ অনেক কিছু আছে ওতে। সেদিন রানা এই সম্ভাবনার কথা মনে করিয়ে দেয়ার পর ধারণাটা মাথায় আসে ইতির, বুঝতে পারে এ ধরনের ফাইলের অস্তিত্ব থাকা খুবই স্বাভাবিক। তাই পরদিন থেকেই কাজের ফাঁকে ফাঁকে খুঁজতে শুরু করে দেয় সেটা। অত্যন্ত সাবধানে। মাওলানা যখন অফিসে থাকত না, তখন। কারণ মাওলানার পিসির সাথে মাস্টার কম্পিউটারের সংযোগ আছে, ওটায় কে কি করছে ইচ্ছে করলেই নিজেরটায় দেখতে পায় সে। ফাইল পাওয়া গেছে তিনদিন আগে। আজকে সীটে বসে কেরামতুল্লাকে ঝিমাতে দেখে চট্ করে কাজটা সারতে গিয়েছিল।

পাওয়ার অন করে ড্রাইভে সিডি ভরল ইতি। অভ্যস্ত হাতে আঙুল নাচতে লাগল কী বোর্ডে। কয়েক সেকেন্ড পর থেমে গেল, চোখ কুঁচকে স্ক্রীনের দিকে তাকাল। সিডি ওপেন হচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই আসছে না তালিকাটা। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার কম্যান্ড দিল, ফলাফল একই। পর্দায় বড় বড় অক্ষরে ভাসছে: ওয়ার্নিং। আনএবল্ টু রান প্রোগ্রাম। ইউজ রেস্ট্রিকটেড টু ডেডিকেটেড সিস্টেমস। ফের ক্যমান্ড দিল ও।

এবার অন্য মেসেজ: প্রবলেম। সিস্টেম লেভেল ইনক্রিপশন এনকাউন্টারড্, সিলেক্ট ডিক্রিপশন মেথড।

খুশি হলো ইতি, সফটওয়্যারে ক্লিক করল। সঙ্গে সঙ্গে নতুন মেসেজ দেখা দিল—ডিক্রিপশন প্রবলেম। ইউজ রেস্ট্রিকটেড টু ডেডিকেটেড সিস্টেমস্। হার্ডওয়্যার ডিক্রিপশন রিকওয়ায়্যার্ড।

'যাহ্!' রুদ্ধশ্বাসে বলল ও। কাঁধ ঝুলে পড়ল হতাশায়। এর অর্থ ফাইলটা সম্পূর্ণ হ্যাকারপ্রুফ, গ্লোবালের মাস্টার কম্পিউটার ছাড়া আর কোনটাতেই ওপেন হবে না। চরম সত্যটা বুঝতে পেরে বোকার মত বসে থাকল ইতি। ওয়েটার চা নিয়ে এসে মৃদু কাশি দিয়ে ওর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করল।

একই মুহূর্তে, কে-কে ভবনে খাদেম শমশের আলিও মৃদু গলায় খাঁকারি দিয়ে মাওলানা কেরামতুল্লাহ্র দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করল। 'মেয়েটার খোঁজ পাওয়া গেছে, হুজুর,' বলল সে।

খুব একটা প্রতিক্রিয়া হলো না মাওলানার। সামনে বসা রজব আলির ওপর থেকে নজর সরিয়ে খাদেমের দিকে তাকাল সে, একদম শান্ত গলায় বলল, 'কোথায় আছে ও?'

'মহাখালিতে, হুজুর। একটা বাড়িতে লুকিয়ে আছে।'

'বাড়িটা কার?'

'এখনও জানতে পারিনি, হুজুর। চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'

পূর্ণ দৃষ্টিতে লোকটাকে দেখল কেরামতুল্লাহ্। পাঁচ ফুট আটের মত দীর্ঘ সে। চওড়া হাড়ের কাঠামো, ছিমছাম দেহের গঠন। বয়স পঞ্চাশের মত। অবাঙালী। এখন অবশ্য তা আর বোঝার উপায় নেই। প্রায় বাঙালীদের মতই বাংলা বলে। গালে চাপ-দাড়ি। বাঁ চোখের নিচে, গালে, ইঞ্চি দুয়েক লম্বা একটা কাটা দাগ। নাকটা খাড়া। একসময় হাতির পুল বাজারে কসাইয়ের কাজ করত সে। এখনও ওই কাজই করে, তবে গরু বা খাসী নয়, মানুষ জবাই করে। দলের শৃঙ্খলা বিরোধীদেরকে, অথবা সংগঠনের প্রতি হুমকি হয়ে উঠতে পারে বলে কাউকে সন্দেহ হলেই তাকে টঙ্গীতে নিয়ে খতম করে দেয়া হয়। কাজটা তৃপ্তির সাথেই করে শমশের আলি। তার কাছে জবাই করার মজাই অন্যরকম।

হুজুর হুকুম দিলে কাজটা করা হয় টঙ্গীতে, ফ্যাক্টরির এক গোপন কক্ষে। মাটির নিচে। গরু, খাসী জবাই করার মত নির্বিকার ভঙ্গিতে মানুষের গলায় ছুরি চালাতে পারে শমশের আলি, চোখের পাতা পর্যন্ত কাঁপে না। একাত্তরেও কাঁপত না, যখন মীরপুরে প্রচুর বাঙালীকে জবাই করেছে সে তরুণ বয়সে। বাপ হায়দার আলির কাছে এ কাজে হাতে খড়ি তার। সে-ও ছিল কসাই।

'সেই মেয়েটাই তো?' বলল মাওলানা। 'না কি ভুলে আর কাউকে…' খাদেমকে মাথা নাড়তে দেখে থেমে গেল।

'জ্বি না, হুজুর। ওকেই পিছা করা হয়েছে। পথে দু'বার ট্যাক্সি বদল করেছে মেয়েটা। প্রথমে গেছে শেরাটন হোটেলে, ওখানে মিনিট দশেক থেকে বোরখা খুলে বেরিয়ে এসেছে, দুসরা ট্যাক্সি নিয়ে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে ইস্টান (ইস্টার্ন) প্লাজায় গিয়ে ফির…'

'বুঝেছি,' হাত তুলে বাধা দিল মাওলানা। 'আর বলতে হবে না। এর অর্থ আপনার ইনফর্মাররা ভালই কাজ দেখিয়েছে। মারহাবা, খাদেম শমশের আলি। ভাবছিলাম ওর মা-বাবাকে ধরে নিয়ে আসতে বলব আপনাকে, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তার আর দরকার নেই।'

'জ্বি, হুজুর। কোই জরুরাত নেহি হ্যায়।'

'কিন্তু ওদের বাড়ির ওপর নজর রাখুন। কারা ওখানে আসা-যাওয়া করে জানতে হবে।'

'জ্বি, হুজুর। মহাখালিতেও একজনকে রেখে এসেছি আমি।'

মাথা দোলাল মাওলানা। 'শয়তানের ওয়াসওয়াসায় পড়েছে মেয়েটা। ধরে নিয়ে আসুন, জানতে হবে কাদের হয়ে কাজ করছে ও।'

'জ্বি, হুজুর,' বলল বটে শমশের, কিন্তু চেহারায় দ্বিধা ফুটল। নড়ল না জায়গা থেকে।

'দাঁড়িয়ে কেন?' চোখ কোঁচকাল মাওলানা।

'হুজুর, বাড়িটা দেখলে সাধারণ বাড়ি বলে মনে হয় না।'

'কেন?'

'ওটার দেয়াল বেশ উঁচু, তার ওপরে আবার মজবুত কাঁটাতারের বেড়া আছে। গেটে দুজন গার্ডও আছে, স্টেনগান নিয়ে পাহারা দেয়। ওদের সবকিছু অন্যরকম, আমি নিজে দেখে এসেছি।'

'এতক্ষণ বলেননি কেন!' চিন্তায় পড়ে গেল মাওলানা। 'পুরো বর্ণনা দিন ওটার,' বলে চোখ বুজল। ধৈর্যের সাথে শুনল সব। মাথা ঝাঁকাল। 'তো কি! তাহলে তো আপনার কাজ আরও সহজ হয়ে গেল। সঙ্গে একটা ইএমপি নিয়ে যান, মেয়েটাকে দিয়েই বিসমিল্লাহ্ করে আসুন। আসল সময় ওটা কেমন কাজ দেবে, তার পরীক্ষা হয়ে যাক্ এই উছিলায়।'

চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল লোকটার। 'জরুর!'

বিশ মিনিট পর চারজনের একটা দল নিয়ে জায়গামত পৌঁছল সে। ওয়াচার খাদেমকে ফিরে যেতে বলে বাড়িটার একটু দূরে বসার উপযুক্ত জায়গা খুঁজতে লাগল। তখনই গাড়ির আওয়াজ উঠল। তাদের কয়েকগজ দূর দিয়ে ধীরগতিতে এগিয়ে গেল ওটা। সেই বিশেষ বাড়ির গেটে একটু থামল, তারপর ভেতরে ঢুকে গেল।

প্রায় ছয় ফুট দীর্ঘ একজনকে নামতে দেখা গেল গাড়ি থেকে, বাড়ির মধ্যে চলে গেল লোকটা। চেষ্টা করেও তার চেহারা দেখতে পেল না শমশের আলি। দুজন করে দু'ভাগ করল সে দলটাকে, দ্বিতীয় দলকে তাদের কাজ বুঝিয়ে দিল। আলাদা হয়ে দু'দিকে চলল তারা।

সবে সন্ধে হলেও মহাখালির এই অংশটা একেবারেই নির্জন। এখানকার বেশিরভাগ বাড়ি নির্মাণাধীন বলে এ সময় মানুষ তেমন একটা থাকে না। যারা থাকে তারা হয় মিস্ত্রি-জোগালি, অথবা কেয়ারটেকার। কাজেই চারদিক একদম নির্জনই বলা চলে। খুশি হলো শমশের আলি, কোনও ঝুট ঝামেলায় পড়তে হবে না তাদেরকে।

তারওপর ঘন মেঘ জমেছে আজ আকাশে, বাতাস থম্ মেরে আছে। ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়ে যেতে পারে যে কোন সময়। বাড়িটার ষাট-সত্তর গজ দূরে, উল্টোদিকের এক অর্ধসমাপ্ত বাড়ির আড়ালে অবস্থান নিল চীফ খাদেম, লম্বা দম ছেড়ে ইএমপি গানের বিযুক্ত যন্ত্রাংশগুলো দ্রুত, অভ্যস্ত হাতে জোড়া লাগাল।

তার বাঁ নিতম্ব বরাবর কোমরের বেল্টের সাথে ক্লিপ দিয়ে আটকানো আছে ওটার সাইটিঙের ব্যাটারিচালিত পাওয়ার প্যাক, তার দিয়ে সাইটের সঙ্গে যুক্ত। ওটার সুইচ অন করল। প্যাকটার আকার মাঝারি একটা ডিকশনারির মত, প্লাইউডের তৈরি। ভেতরটা নানান জটিল যন্ত্রপাতিতে ঠাসা, তার সাথে আছে ছয়টা স্ট্যান্ডার্ড সাইজ ব্যাটারি। লিভারের মত উঠে আছে একটা সুইচ।

ওটা অন করলেই হালকা আলো বেরোতে শুরু করে প্যাক থেকে, সাইট হয়ে ছুটে যায় লক্ষ্যের দিকে। এতই ক্ষীণ যে আশপাশের কারও চোখে তেমন একটা পড়ে না। কেবল শিকারী আর শিকার দেখতে পায়। আলোটা যখন শিকারের

গায়ের ওপর পড়ে, তখন দেখতে পায় সে। কিন্তু তাতে তার ফায়দা কিছুই হয় না, কেননা ওটা কিসের আলো, কোত্থেকে এসেছে, ইত্যাদি বুঝে ওঠার আগেই খতম হয়ে যায় সে।

সাইটে চোখ রেখে একটু একটু করে ব্যারেল ঘোরাতে লাগল শমশের আলি। ছুটে গিয়ে প্রথমে এক ন্যানো-সেকেন্ডের জন্যে দেয়ালে বাধা পেল আলোটা, তারপর আবছা হয়ে গেল দেয়াল, পেনিট্রেট করল আলো।

দোতলার সামনের দিক থেকে দ্বিতীয় রুমে শিকারকে সনাক্ত করল ওটা। একটা টেবিলের সামনে বসে আছে, আঙুল চলছে দ্রুত, কম্পিউটরের কী-বোর্ডের ওপর। তার দু'ফুট সামনে একটা মনিটর। পাশে দীর্ঘদেহী এক লোক দাঁড়িয়ে আছে, মনিটরের দিকে তাকিয়ে আছে ঝুঁকে। সেই লোকটাই বোধহয়, একটু আগে যে এলো।

তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে মেয়েটার ওপর আলোটা স্থির করল শমশের আলি, ঠোঁট চাটল। এক্স-রের সাহায্যে কারও পুরো দেহের তোলা ছবি যেমন হয়, ইতিকে এ মুহূর্তে ঠিক তেমনি দেখতে পাচ্ছে সে। ছবির নেগেটিভের মত। ওর সুগঠিত নিতম্ব, পেট, ভরাট বুকের একটা অংশ, স-ব। আরেকবার ঠোঁট চাটল লোকটা, ঢোক গিলল নিঃশব্দে। এত বছর ওকে বোরখায় আবৃত দেখেছে সে, এই রূপে আজই প্রথম।

একটু পর হুঁশ হতে নিজেকে চোখ রাঙাল, ট্রিগার গার্ডের ওপর থেকে তর্জনী পিছিয়ে এনে ট্রিগারের ওপর রাখল। একটু একটু করে চাপ বাড়াতে লাগল ওটার ওপর।

ইতির চা শেষ হওয়ার আগেই রুমে ঢুকল মাসুদ রানা। 'দুঃখিত। খুব জরুরী একটা কাজে আটকে গিয়েছিলাম। আসতে দেরি হয়ে গেল।' ওর মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসল। 'তারপর? ধরা পড়লে কিভাবে?'

ইতস্তত করতে লাগল ইতি। কি বলবে ভাবছে।

'কই, শুরু করো!' তাড়া লাগাল রানা।

'এমনটা ঘটবে আমি চিন্তাই করিনি, রানা ভাই,' আমতা আমতা করে বলল মেয়েটা। 'এত সাবধানে...'

এক হাত তুলে বাধা দিল ও। 'সেসব থাক্, বলতে হবে না। তুমি কাজটা যথেষ্ট সতর্কতার সাথেই করতে চেয়েছ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তারপরও এরকম ঘটনা ঘটে। শত সতর্কতাও শেষ পর্যন্ত কোন কাজে আসে না। এটাকে একটা দুর্ঘটনা বলে মেনে নাও। এবার বলো, কিভাবে কি ঘটল।'

'বলছি। মা-বাবা...'

'ওঁদের কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি ফোন করার দশ মিনিটের মধ্যে তোমাদের বাড়িতে সাদা পোশাকের এক ডজন গার্ড পৌঁছে গেছে। বাইরে থেকে পাহারা দিচ্ছে ওরা। কারও সাধ্য নেই বাড়ির ভেতরে ঢোকে। তবু বাড়তি সতর্কতা হিসেবে মাঝরাতের পর তাঁদেরকে আর কোথাও সরিয়ে ফেলা হবে। সন্তুষ্ট?'

স্বস্তির হাসি ফুটল ইতির মুখে। মাথা দোলাল। 'জ্বি।' অফিসে কিভাবে কি ঘটেছে তার পুরো বর্ণনা দিতে শুরু করল ও। শেষ পর্যায়ে সিডির প্রসঙ্গ উঠতে নড়েচড়ে বসল রানা। 'ওটা কোথায়?'

'এটার ড্রাইভে,' ইঙ্গিতে কম্পিউটারটা দেখাল ও। 'আপনি সেদিন ঠিকই সন্দেহ করেছিলেন। সব কয়জনের নাম-পুরো ঠিকানা খুঁজে পেয়েছি আমি গ্লোবালের মেইন কম্পিউটারে। অনেকগুলো নাম চেক করে দেখেছি, একজনকেও চিনতে পারিনি। লোকগুলো যে কোম্পানির কর্মচারী না, সে ব্যাপারে এখন এক ফোঁটাও সন্দেহ নেই আমার। ওরা আর কিছু হবে। শুধু নাম না, আরও অনেক কিছু আছে ওই ফাইলে। ফাইলের নামটাও বেশ অদ্ভুত।'

'কি?'

'খাঁচার পাখি।'

হা-হা করে হেসে উঠল রানা। 'খাঁচার পাখি? বাহ্, বেশ! তোমার বসের রসবোধের প্রশংসা না করে পারছি না। চমৎকার নাম রেখেছে ওদের। কই, দেখি, ওপেন করো। ওদের...'

'একটা সমস্যা আছে, রানা ভাই,' মৃদু গলায় বলল ইতি।

'কি সমস্যা?'

'ওপেন করা যাচ্ছে না ফাইলটা। আমি অনেকক্ষণ থেকেই চেষ্টা করছি, কাজ হচ্ছে না। সম্পূর্ণ হ্যাকারপ্রুফ ওটা।'

হাসি মুছে গেল ওর মুখ থেকে। 'তাই নাকি! তাহলে তো সমস্যা।'

'জ্বি। কমান্ড দিলেই হার্ডওয়্যার ডিক্রিপশন দাবি করছে।'

'সেটা কি?'

'এক কথায় এর অর্থ, যেটা থেকে কপি করা হয়েছে, সেই কম্পিউটার ছাড়া রান করবে না এই সিডি।'

ঠোঁট গোল করে নিঃশব্দে শ্বাস টানল রানা। 'ভালই খেলা জানে দেখছি তোমাদের কেরামতুল্লাহ্! ক'বার ট্রাই করেছ?'

'দু'বার।'

'আচ্ছা, আরেকবার করে দেখো। লাস্ট ট্রাই। দান-দান-তিনদান বলে একটা কথা আছে না? যদি বাইচান্স গান গেয়ে ওঠে খাঁচার পাখি!'

ওর ভঙ্গি দেখে হাসল ইতি, মাথা নাড়ল। 'সেরকম হলে প্রথমবারেই কাজ হয়ে যেত, রানা ভাই। তবু আপনি যখন বলছেন, দেখি আরেকবার।'

ঘুরে বসে কী বোর্ড নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও। বাইরে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল, বাজ পড়ল দূরে কোথাও। রানা উঠে এসে ইতির পাশে দাঁড়াল, সামান্য ঝুঁকে মনিটরের দিকে তাকিয়ে আছে। দু'বার চেষ্টা করল মেয়েটা, দু'বার একই মেসেজ ফুটল স্ক্রীনে: হার্ডওয়্যার ডিক্রিপশন চায়।

'হুঁম, বোঝা গেল,' বলল রানা। 'ঠিক আছে, সিডিটা দাও আমাকে। দেখি, অন্য কি ব্যবস্থা করা যায়।'

ড্রাইভ থেকে চাকতিটা বের করল ইতি, ওর দিকে বাড়িয়ে ধরেছে, ঠিক তখনই ব্যাপারটা খেয়াল করল রানা। পেন্সিল টর্চের ফোকাসের মত একটা

হালকা সবুজ, ক্ষীণ আলো ইতির বাঁ কানের ওপর নড়াচড়া করছে। কয়েক মুহূর্ত এদিক-ওদিক করল ফোকাসটা। তারপর স্থির হলো, যেন এতক্ষণে বসার মত জায়গা পেয়েছে। জিনিসটা কি বোঝার জন্যে ঝুঁকল ও, একই সাথে বাঁ হাতে কোটের ভেতরের পকেটে রাখল সিডিটা।

ঠিক সচেতনভাবে নয়, সন্দেহ হওয়ায় অবচেতন মনের রিফ্লেক্স কাজটা করাল ওকে দিয়ে। সিডি রেখেই ডান হাত বাড়িয়ে খপ্ করে মেয়েটার বাহু চেপে ধরল রানা, অন্য কিছু সন্দেহ করে অবাক হয়ে মুখ তুলল ইতি, 'কি!'

উত্তর দেয়ার দরকার মনে করল না রানা, এক হ্যাঁচকা টানে ওকে চেয়ার থেকে ফেলে দিল মেঝের ওপর। পরমুহূর্তে কড়াৎ শব্দে বিস্ফোরিত হলো রুমের দেয়াল, এইমাত্র ইতির মাথা যেখানে ছিল, ঠিক সেই বরাবর। একই সঙ্গে চুরমার হয়ে গেল মনিটর, ভয়ে চিৎকার করে উঠল মেয়েটা।

শোল্ডার হোলস্টার থেকে এক ঝটকায় নিজের সর্বক্ষণের সঙ্গী, ওয়ালথার পিপিকে বের করে ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রানা, বোকার মত তাকিয়ে থাকল দেয়ালের বড়সড় গর্তটার দিকে। দিন হলে বাইরের সবকিছু দেখা যেত, কিন্তু এ মুহূর্তে কেবল বিদ্যুতের চোখ ঝলসানো চমক এবং কয়েকটা গাছ ও অর্ধসমাপ্ত ভবনের একাংশ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না।

আবার বিস্ফোরিত হলো দেয়াল, ওর চোখের সামনে দেয়ালের তিন-চারটে লাল ইঁট স্থানচ্যুত হয়ে শূন্যে লাফিয়ে উঠল, টুকরো টুকরো হয়ে ছুটল চতুর্দিকে। কিন্তু সেদিকে ওর লক্ষ নেই, মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে ও, ইতিকেও শুইয়ে দিয়েছে। কার্পেটের সাথে ঠেসে ধরে রেখেছে ওর মাথা।

আতঙ্কে চেঁচাচ্ছে মেয়েটা, কাঁদছে, ফোঁপাচ্ছে। রানার শক্ত মুঠো থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পালাতে চাইছে। ওর জোরাজুরিতে একসময় ত্যক্ত হয়ে কড়া এক ধমক লাগাল রানা। 'শুয়ে থাকো, বোকা মেয়ে! মরতে চাও নাকি?'

কাজ হলো, লাফঝাঁফ থেমে গেল ইতির, কিন্তু কাঁপছে ঠক্-ঠক্ করে। আবার বিস্ফোরিত হলো দেয়াল, তবে বাজ পড়ার বিকট শব্দের তলায় চাপা পড়ে গেল আওয়াজটা। এক দেয়াল দিয়ে ঢুকছে, পরমুহূর্তে বেরিয়ে যাচ্ছে পরবর্তী দেয়ালটা ভেদ করে। আতঙ্কে চিকন ঘাম দেখা দিল রানার কপালে। ভাল কেরামতি দেখাচ্ছে তো কেরামতুল্লাহ্! নিচে একটা হই-চই শোনা গেল, সেই সাথে স্টেনগানের গুলির আওয়াজ। চিত হয়ে শুলো ও, রুমের দুটো টিউব লাইট গুলি করে উড়িয়ে দিল।

অন্ধকারে ডুবে গেল রুম। ও ভেবেছে এতে কাজ হবে। কিন্তু হলো না, আরও দুটো গুলি হলো পরপর। দুটোই ওদের সামান্য ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে পিছনের দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল।

কি দিয়ে আক্রমণ চালাচ্ছে ওরা? ভাবল ও। মর্টার নয়, মর্টার হলে বিকট শব্দ হত। কিন্তু এই বিস্ময়কর অস্ত্র তেমন আওয়াজও করছে না, এবং ওরা কোথায় আছে, ঠিকই খুঁজে বের করছে সবুজ একটা ফোকাস। কি ওটা? এখন আর চিকন নয়, মোটা ধারায় দরদর করে ঘামছে ও, রীতিমত অসহায় বোধ করছে এমন অদ্ভুত অস্ত্রের গুলির তোড়ের মুখে পড়ে।

ওদিকে প্রথম গুলিটা মিস হয়েছে দেখে আস্ত গাধা বনে গেল খাদেম শমশের আলি। অবশ্য তা মুহূর্তের জন্যে, রানার উদ্দেশে মাতৃভাষায় জঘন্য কয়েকটা গাল দিয়ে ফের অস্ত্র তুলল সে, ট্রিগার টেনে দিল মেঝেতে বসা ইতির মাথা সই করে। কিন্তু তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে এটাও মিস করল। এর পরপরই অদৃশ্য হয়ে গেল মেয়েটা। শমশের আলি বুঝল মেঝেতে শুয়ে পড়েছে ও।

বুঝল বলেই ভয় পেয়ে গেল। ইএমপি গানের টাংস্টেন গুলি আড়াই ফুট পর্যন্ত ইঁটের দেয়াল ভেদ করতে পারে, একই সমান আরসিসি কলাম, বীম বা ফ্লোর ভেদ করতে পারে। কিন্তু তার বেশি ভেদ করার সাধ্য নেই ওগুলোর। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে মেয়েটাকে খতম করতে হলে এগুলোকে সেই অসাধ্যই সাধন করতে হবে।

মন দমে গেল শমশের আলির। ভেবেছিল একটা, বড়জোর দুটো গুলিতে কাজ সেরে নির্বিঘ্নে সরে পড়বে। কিন্তু হলো না। ওদিকে বাড়ির গার্ডরা দুটো গুলি হওয়ার পরই ব্যাপার টের পেয়ে গেছে, তাদের অবস্থান লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে। ওদেরকে ঠেকাতে দুজন সঙ্গীকে আগেই বাড়িটার যথাসম্ভব কাছে গিয়ে অবস্থান নিতে পাঠিয়েছে সে। ব্যাপার টের পেয়ে পাল্টা হামলা চালাতে গেলে তাদেরকে ঠাণ্ডা করে দিতে নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু তেমন কিছু ঘটছে না ওদিকে। উল্টে গার্ডরাই ব্রাশ ফায়ার করছে, হই-চই শুরু করে দিয়েছে ব্যাটারা। এর মানেটা কি? তার সঙ্গীরা নিজেরাই ঠাণ্ডা হয়ে গেল না তো?

কাজ হবে না জানে, তবু গেটের দিক থেকে আসতে থাকা বিপদ অগ্রাহ্য করে আন্দাজে আরও দুটো গুলি চালাল সে নির্দিষ্ট রুম সই করে। এমন সময় অন্ধকার হয়ে গেল ওটা–আলো নিভিয়ে দেয়া হয়েছে। তাতে অবশ্য কিছু যায় আসে না। ইএমপি গানের সাইটের দেখার বিশেষ চোখ আছে, অন্য আলোর সাহায্য লাগে না। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এ মুহূর্তে ওটার বিশেষ চোখও অন্ধ।

সে যে অ্যাঙ্গেলে রয়েছে, সেখান থেকে শিকারকে খুঁজে বের করতে হলে কেবল ফ্লোরই নয়, নিচতলার ওপরদিকের দেয়ালও ভেদ করে যেতে হবে। এতসব বাধা অতিক্রম করার সাধ্য নেই ওটার, জানা কথা। তবু বৃথা জেদের বশে আরও এক হালি গুলি খরচ করে ক্ষ্যান্ত দিল শমশের। আর না, সময় থাকতে সরে পড়া উচিত এবার।

হারামজাদা গার্ড দুটো যে হারে গুলি ছুঁড়ছে, তাতে পুলিস এসে জড়ো হলো বলে। এই মাল হাতে ধরা পড়া যাবে না, কিন্তু রক্ষা পেতে হলে এটা ব্যবহার করতে হবে পুলিসের বিরুদ্ধে। সেটা হুজুর পছন্দ করবেন না, আপাতত ম্যাসাকার করার অনুমতি নেই। কাজেই সঙ্গীকে পিছিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত করে সে নিজেও নিচু হয়ে পিছাতে লাগল। এক মিনিটও হয়নি, তার আগেই মিশন অসমাপ্ত রেখে সরে পড়তে বাধ্য হলো সে। আর ঠিক তখনই ঝমঝমিয়ে নামল বৃষ্টি।

অন্যদিকে, আর গুলি আসছে না দেখে একটু স্বস্তি বোধ করল রানা। ক্রল করে দেয়ালের কাছের ফোকরটার দিকে এগোল। নিচে অনবরত গুলি ছুঁড়ছে গার্ডরা। স্টেনগানের তীক্ষ্ণ গর্জনের শব্দে কানে তালা লেগে যাওয়ার দশা। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে আওয়াজটা ভীতিকর লাগছে কানে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আল্লার নাম নিয়ে মাথা সামান্য উঁচু করল ও, বাইরে কি চলছে দেখার চেষ্টা করল। অন্ধকার ছাড়া চোখে পড়ল না কিছুই। লোকজনের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ডাকাত পড়েছে ভেবে চড়া গলায় হাঁকডাক ছাড়ছে তারা। আকাশ চমকাল, সেই আলোয় সামনের রাস্তা ও আশপাশটায় দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল রানা। কেউ নেই। গাছের শাখা ছাড়া নড়ছে না কিছু।

আরও কিছু সময় অপেক্ষা করে উঠে পড়ল ও।

আধ ঘণ্টা পর।

তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে এখনও। আগেরটার পাশের রুমে বসে আছে রানা ও ইতি। মেয়েটার মুখের সব রক্ত ফেরেনি এখনও, চেহারা ফ্যাকাসে। ঠোঁট সাদা, কাঁপছে একটু একটু।

রানা গম্ভীর। থমথমে চেহারায় নিজের ভেজা জুতো দেখছে। একটু আগে বাইরে থেকে ফিরেছে। কোত্থেকে আক্রমণ হয়েছে, জায়গাটা খুঁজে বের করতে গিয়েছিল। পাওয়া গেছে। এ বাড়ির উল্টোদিকে, ষাট-সত্তর গজ দূরের অর্ধসমাপ্ত এক বাড়ির পোর্চ থেকে টার্গেট প্র্যাকটিস করা হয়েছে। ওখানকার নরম মাটিতে দু'জোড়া পায়ের গভীর ছাপ দেখতে পেয়েছে রানা। মেইন রোডের দিকে চলে গেছে।

ওখানটায় অদ্ভুত কিছু গুলির খোসাও পেয়েছে ও। নস্যির কৌটোর মত দেখতে। ওগুলো কিসের হতে পারে, হাজার মাথা খাটিয়েও কিছুই বুঝতে পারছে না। এমন মাল দেখা তো দূরের কথা, আছে বলে শোনেওনি রানা জীবনে কখনও। বিসিআইয়ের এক্সপার্টদেরকে দেখাতে হবে ওগুলো। কিন্তু তারা কিছু বুঝবে কি না, তাতে গভীর সন্দেহ আছে।

এদিকে গেটের দুই গার্ড বলছে আক্রমণকারী আরও দু'জন ছিল। ওরাই তাদের ওপর প্রথমে হামলা চালিয়েছে, তবে ঠিক সময়ে বিদ্যুৎ চমকে ওঠায় লোক দুটোকে আগেই দেখে ফেলে তারা। নইলে পরিস্থিতি অন্যরকম হতে পারত। তাদের বেপরোয়া পাল্টা আক্রমণের সামনে টিকতে না পেরে দিশাহারা হয়ে ঝিলে ঝাঁপ দিয়েছে লোক দুটো। সামনে আরও শত্রু ছিল বলে তাদেরকে ধাওয়া করা সম্ভব হয়নি গার্ডদের পক্ষে।

ইতিকে সাহস জোগানোর জন্যে মৃদু হাসল রানা। 'বোঝা যাচ্ছে এতবার ট্যাক্সি বদল করেও ওদের চোখকে ফাঁকি দিতে পারোনি তুমি।'

'কিন্তু···কি করে···!'

'আমিও তাই ভাবছি।'

আরও আধ ঘণ্টা পর।

একটা সাদা অ্যাম্বুলেন্স নীরবে এসে দাঁড়াল ইন্দিরা রোডে ইতিদের দোতলা বাড়ির সামনে। ঝমঝম বৃষ্টির কারণে রাস্তা প্রায় ফাঁকা। সামনের আসনে বসে আছে অ্যাপ্রন পরা দুই যুবক, বৃষ্টি উপেক্ষা করে নেমে পড়তে যাচ্ছিল তারা। এমন সময় প্যাসেঞ্জারস সীটে বসা যুবক আঁতকে উঠল, ডোর হ্যান্ডেলের ওপর

আঙুল আড়ষ্ট হয়ে গেল তার একেবারে নাকের সামনে, জানালার বাইরে কঠিন চেহারার দুটো মুখ দেখে। রেইন কোট পরে আছে তারা, চেহারা দেখেই বোঝা যায় সাধারণ লোক নয়।

সম্ভবত বিপদ থেকে বাঁচার দোয়া দরূদ মনে করার চেষ্টা করছিল সে, এই সময় বন্ধ জানালায় জোরে জোরে টোকা দিল একজন। বাধ্য হয়ে কাঁচ নামাল যুবক।

'এখানে কি চাই আপনাদের?' কড়া গলায় প্রশ্ন করল লোকটা।

'জ্বি...আমরা ক্লিনিক থেকে এসেছি, রুগী নিয়ে যেতে।'

'কোন ঠিকানায়? বাসা নম্বর কত?' নাকে পেইন্টের তাজা গন্ধ পেল সে, অ্যাম্বুলেন্সের গায়ে ক্লিনিকের ছাপটা দেখল চোখ কুঁচকে। নিশ্চয়ই কিছুক্ষণ আগে স্টেনসিল করে বসানো হয়েছে ওটা, ভাবল সে, কুইক ড্রাইং পেইন্ট দিয়ে।

'ইয়ে...' পাশের জনকে প্রশ্ন করল সে। 'কত যেন?'

'বাড়ির নম্বর একুশ।'

'একুশ নম্বর বাড়ি? এই রোডে কোন একুশ নম্বর বাড়ি নেই।'

'সে কি!' অবাক হলো দ্বিতীয় যুবক। 'আমাদেরকে তো এই লোকেশনই দেয়া হয়েছে।'

জিভ দিয়ে 'চুক্' করে বিরক্তি প্রকাশ করল প্রথম লোকটা, সঙ্গীর দিকে ফিরে বলল, 'তাহলে হয়তো কোন ফাজিল ছেলে-ছোকরার কাজ হবে, কি বলো? মজা করার জন্য এদেরকে ভুয়া ঠিকানা...' থেমে তাদের দিকে ফিরল সে।

'মোবাইল ফোন আছে আপনাদের সঙ্গে?'

'না,' মিথ্যে বলল প্রথম যুবক। 'নেই।'

পকেট থেকে নিজেরটা বের করল সে। 'ঠিক আছে, আপনাদের ক্লিনিকের নম্বর বলুন। আমি দেখছি ওখানে রুগীর ফোন নম্বর পাওয়া যায় কি না। কত...?'

কথা শেষ করার সময় পেল না লোকটা, তার আগেই লাফ দিল অ্যাম্বুলেন্স, ভোঁ করে ছুট লাগাল মানিক মিয়া অ্যাভিনিউর দিকে। সেদিকে তাকিয়ে সেটটা পকেটে ভরল সে। চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সঙ্গীর উদ্দেশে বলল, 'ফলো করো।'

দৌড় দিল লোকটা, ইতিদের বাউন্ডারি ওয়ালের ভেতরে রাখা থ্রী ফিফটি সিসির একটা রেসিং হোন্ডা নিয়ে প্রায় সাথে সাথে বেরিয়ে এসে পিছু নিল অ্যাম্বুলেন্সের। হেডলাইট জ্বালল না। অ্যাভিনিউতে পড়ে আইল্যান্ড ঘুরে মীরপুরের দিকে ছুটল সে, বড়জোর তিনশো গজ সামনে রয়েছে 'অ্যাম্বুলেন্সটা'। প্রায় ফাঁকা রাস্তা দিয়ে পানি ছিটিয়ে তুমুল গতিতে ভাগছে।

মীরপুর দশ নম্বর গোল চক্করে পৌঁছে ডানে ঘুরল ওটা, ইব্রাহিমপুর হয়ে কচুক্ষেতের দিকে এগোল। ঢুকে পড়ল ক্যান্টনমেন্টে। ঢুকেই বাঁয়ে ঘুরে মেইন রোডে উঠল, খানিকটা গিয়ে আবার ডানে। এমইএস গেট দিয়ে বেরিয়ে এয়ারপোর্ট রোডে পড়ে শেষবারের মত বাঁয়ে মোড় নিল, সোজা ছুটল টঙ্গীর পথ ধরে।

এদিকে, হোন্ডা চোখের আড়ালে চলে যেতে কঠোর হাসি ফুটল প্রথম অসাধারণের চৌকো মুখে। বিসিআইয়ের ইমার্জেন্সি আর্মড ফোর্সের প্রধান সে,

এক্স ক্যাপ্টেন হাবিবুল বাসার। 'অ্যাম্বুলেন্সটার' উদ্দেশ্য এক মিনিটের মধ্যেই টের পেয়ে গিয়েছিল সে, ইচ্ছে করলে ব্যাটাদের আটক করতে পারত। কিন্তু করেনি মেজর মাসুদ রানার বারণ আছে বলে।

এ মুহূর্তে কোনরকম ধরপাকড় করতে গেলেই সতর্ক হয়ে যাবে কেরামতুল্লাহ্, সমস্ত প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে।

চার

পলেতওয়া। বাংলাদেশ-মায়ানমার বর্ডারের ওপাশের অত্যন্ত দুর্গম এক পাহাড়ী এলাকা। চারদিকে গভীর অরণ্য।

সাগরপিঠ থেকে দেড় হাজার ফুট উঁচু এবং বঙ্গোপসাগর থেকে এক মাইল ভেতরে জায়গাটা। গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে নীলের বিস্তৃতি পরিষ্কার দেখা যায়। বনের মধ্যে কয়েক একর জায়গা একদম ফাঁকা, বর্তমানে 'খাঁচার পাখি'দের ট্রেনিং গ্রাউন্ড সেটা। বেশ কিছু মজবুত কাঠের ঘর আছে জায়গাটাকে ঘিরে। তার মধ্যে একদিকে আছে কমান্ড হেডকোয়ার্টার্স, ব্যারাক, আর্মস ও অ্যামিউনিশনস্ স্টোর, ডাইনিং ও কনফারেন্স হল ইত্যাদি। অন্য দিকে আছে সরু, লম্বা একটা এয়ারস্ট্রিপ।

এ মুহূর্তে মাওলানা কেরামতুল্লাহর খাদেম বাহিনীর শেষ ব্যাচের ট্রেনিং চলছে গ্রাউন্ডে। কমান্ড হেডকোয়ার্টার্সের বারান্দায় বসে তাই দেখছে খায়রুল কবীর। আসলে দেখছে না, দেখার ভান করছে। খাঁচার পাখিদের ব্যাপারে এখন আর তেমন একটা আগ্রহী নয় সে। এতদিনেও এদের ওপর পুরোপুরি আস্থা আসেনি তার ভেতর। সেজন্যেই নিজ চোখে সরেজমিনে দেখার জন্য দু'দিন আগে বাংলাদেশে ঢুকেছে সে কলকাতা হয়ে, বেনাপোল দিয়ে।

অলস ভঙ্গিতে চারদিকে নজর বোলাল খায়রুল কবীর। ভাবছে, মানতেই হবে, খুঁজে খুঁজে ভাল জায়গাই বের করেছে মোল্লা কেরামতুল্লাহ্। বাংলাদেশের বাইরে জায়গাটা, কাজেই দেশের তরফ থেকে ভয়ের কোন কারণ নেই। ভয় নেই মায়ানমারের তরফ থেকেও। সব জেনেশুনেও বাধা দেয় না ইয়ানগন। তার একাধিক কারণ আছে। একটা হচ্ছে, ওদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেত্রী অং সান সু চি-কে ক্ষমতাসীন সামরিক সরকারের গৃহবন্দী করে রাখা বাংলাদেশের পছন্দ নয়, সুযোগ পেলেই তাকে মুক্তি দেয়ার পক্ষে বক্তব্য রাখে ঢাকা। ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখে না ইয়ানগন।

আরেক কারণ হলো তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে পাত্তা দেয় না মায়ানমার, ওসব মানে না। ফলে কোন গণতান্ত্রিক দেশের বারোটা বাজলে কিছুই এসে যায় না তাদের। তবে এক্ষেত্রে প্রধান কারণ যে টাকা, খায়রুল কবীরের তা জানা আছে। কেরামতুল্লাহ্‌র তরফ থেকে নিয়মিত বিশাল অঙ্কের টাকা পায় ও-দেশের সরকার প্রধান। ড্রাগ ব্যবসার টাকা। বন্ধু সিরাজুল

ইসলামের মধ্যস্থতায় তাকে হাত করেছে সে। ইয়ানগনে বড় মাপের চোরাচালানী বলে যথেষ্ট কদর আছে লোকটার, তার ওপর সরকার প্রধানের একমাত্র শালা যখন তার 'বিজনেস পার্টনার', তখন আর তাকে ঠেকায় কে।

এখানে কেন কি ঘটছে জানা থাকলেও এসব কারণে বাধা দেয় না ইয়ানগন। সেই সুযোগ নিয়ে এখানে নিশ্চিন্তে ট্রেনিং গ্রাউন্ড খুলে বসেছে কেরামতুল্লাহ্। সিরাজুল ইসলামের প্লেনে করে মানুষ, রসদ ইত্যাদি আনা-নেয়া করে। সব মিলিয়ে ভালই চলছে তার কাজের অগ্রগতি। চলতে থাকুক, মনে মনে বলল খায়রুল কবীর। সময় হলে ও যদি বোঝে ক্ষমতা দখল করা এদের পক্ষে সত্যিই সম্ভব হবে, কেবলমাত্র তখনই এদের হাতে তুলে দেবে সে দশ হাজার ইএমপি গান। অন্যথায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে কোটি কোটি ডলার খরচ করে তৈরি করা এই অমূল্য সম্পদ, বিক্রি করে দেবে চীন বা আমেরিকার কাছে। সব ব্যবস্থা করা আছে তার। ওগুলো জাহাজ থেকে স্রেফ সাবমেরিনে তুলে নিয়েই চম্পট দেবে সে বাংলাদেশের সমুদ্র-সীমা ছেড়ে।

কেরামতুল্লাহর প্ল্যান তার জানা আছে। খাদেম বাহিনীর শেষ ব্যাচের ট্রেনিং শেষ হতে আর কয়েকদিন বাকি, তারপরই বাংলাদেশে ঢুকে পড়বে এরাও। সেখানকার বর্তমান পরিস্থিতি বেশ নাজুক অবস্থায় পৌঁছে গেছে। এই চরম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থবিরতা, সন্ত্রাস ও প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে নানান অন্তর্ঘাতমূলক কাণ্ড-কীর্তি ঘটাতে শুরু করবে এরাও। সুপরিকল্পিতভাবে এমন সব ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি করবে, কয়েক হাজার কোটি নকল টাকা বাজারে ছাড়া থেকে নিয়ে আরও নানান কৌশলে সরকারকে এমনভাবে নাজেহাল করে তুলবে যে, বর্তমান সরকারের ওপর আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে সম্পূর্ণ আস্থা হারাবে দেশের মানুষ।

একই সঙ্গে কেরামতুল্লাহ্ও বাড়িয়ে দেবে তার ব্যাপক 'প্রচার ক্যাম্পেইন'। জনসভা, ধর্মীয় মাহফিল ইত্যাদির নামে সারাদেশে ঘন ঘন সম্মাবেশ ঘটিয়ে জনগণকে বোঝাতে শুরু করবে: ভারতের দাসত্ব থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় এখন পাকিস্তানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইসলামী শাসন মজবুত করা। বোঝাবে, এদেশের সমস্ত অশান্তির মূল কারণ আসলে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। বিগত ত্রিশ বছরে কিছুই পায়নি দেশের মানুষ। বিভিন্ন দলের গুটি কয়েক ব্যক্তি লাভবান হয়েছে কেবল—হাজার হাজার কোটি ডলার বৈদেশিক সাহায্য স্রেফ চুরি করেছে তারা, দেশের মঙ্গলের দিকে ফিরেও তাকায়নি। কোনও সরকারই না। একমাত্র পাকিস্তানই এখন বর্তমান এই চরম দুরবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারে দেশকে। বুকে হাত রেখে বলুক সবাই: পাকিস্তান আমলে ছিল এরকম দুর্নীতি, চাঁদাবাজি আর সন্ত্রাস? বাংলাদেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ, একটু হয়তো দেরি হবে, কিন্তু তার ফাঁদে পা দেবে তাদের বড় একটা অংশ। দেবেই। সরকারের বিরুদ্ধে নানারকম আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করবে।

পরিস্থিতি যখন আরও ঘোরাল হয়ে উঠবে, চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছবে, তখন যদি বোঝে জয় অনিবার্য, কেবল তাহলেই খাদেমদের হাতে অস্ত্র তুলে দেবে খায়রুল কবীর। নিজেরও কয়েকশো সাঙ্গপাঙ্গ ঢোকাবে সে বাংলাদেশে। তাদের কাছে

থাকবে দূরপাল্লার ভারী ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক কামান। এক ধাক্কায় সমস্ত কী পয়েন্ট কব্জা করে নেবে সে। কোন্ কোন্ জায়গা থেকে বাধা আসবে, জানা আছে তার। ঠিক সেইসব জায়গায় হুমকি দেবে সে—সারেন্ডার না করলে গুঁড়িয়ে দেয়া হবে সবকিছু। আস্ত থাকবে না প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট এবং তিন-বাহিনী প্রধানের অফিস, বাসা ও হেডকোয়ার্টার। প্রয়োজন হলে হুমকি কাজে পরিণত করতে শুরু করবে সে এক-এক করে, কে বাঁচল আর কে মরল তার একটুও পরোয়া করবে না। ও জানে, গোটা কয়েক গোলা ঠিক জায়গা মত ফেলতে পারলেই বাকিটুকু কল্পনা করে নিতে অসুবিধে হবে না কারও। কেটে যাবে সব দ্বিধা, তার দূরপাল্লার হেভিওয়েট ইএমপি কামানের কাজ চাক্ষুষ করে পিলে চমকে যাবে প্রতিপক্ষের। ক্ষমতা ফেলে পালাতে পথ পাবে না। এবং ঠিক সেই মুহূর্তে টের পাবে কেরামতুল্লাহ, খাদেমদের ইএমপি অ্যাসল্ট রাইফেল আর একটাও কাজ করছে না—ব্যাটারি শেষ!

সেই শুভ ক্ষণটির অপেক্ষাতেই আছে সে।

অনেক টাকা ইনভেস্ট করেছে খায়রুল কবীর। সিরাজুল ইসলামের নামে টিভির 'খুচরা যন্ত্রাংশ' বলে দশ হাজার ইএমপি গানের পার্টস রফতানী করছে সে লিভারপুল থেকে। এই মুহূর্তে মালের 'চালান' চট্টগ্রামে খালাস হওয়ার অপেক্ষায় আছে। সবই আছে তার মধ্যে, নেই কেবল একটা জিনিস—ট্রিগার মেকানিজম। ওটা সে এখনই এদের হাতে তুলে দিতে রাজি নয়।

এ নিয়ে কেরামতুল্লাহ্ কয়েকবারই প্রশ্ন তুলেছিল। 'সময় হলে পেয়ে যাবেন' বলে তাকে বুঝ দিয়েছে সে। কিন্তু তাতে যে লোকটা সন্তুষ্ট হয়নি, তা-ও তার অজানা নয়। অজান্তে শ্রাগ করল সে, হোক গে অসন্তুষ্ট, তাতে কিছু এসে-যায় না তার।

সামনে তাকাল সে সচকিত হয়ে। ট্রেনিং গ্রাউন্ডে কয়েক সারিতে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোকে দেখছে। পাথরের মূর্তি যেন একেকটা, একচুল নড়ছে না। নজর সামনে স্থির। সবাই ক্যামোফ্লেজড ইউনিফর্ম পরা, পায়ে বুট। সময়মত ড্রেস বদলে যাবে এদের। এখন এগুলো পরে আছে এর কিছু সুবিধে আছে বলে। সবুজ প্রকৃতির সাথে মিশে থাকা যায়, অনুসন্ধিৎসু নজর এড়িয়ে চলা সহজ হয়।

প্যারেড-কলামের বাইরেও আছে কয়েকজন, ওরা 'প্লাটুন' ও 'ইউনিট' কমান্ডার। একশোজন 'খাঁচার পাখি' নিয়ে একেকটা প্লাটুন করা হয়েছে, তিন প্লাটুন নিয়ে একটা ইউনিট। এই কিস্তিতে এরকম মোট দশটা ইউনিট আছে, এর সদস্যরা সময় হলে সরাসরি নামবে 'অপারেশনে'। এদের বাইরেও কিছু আছে গার্ড, কিছু স্পাই, কিছু ইনফর্মার। আরও আছে জনা দশেক, তারা এদের প্রশিক্ষক। এরকম আটটি গ্রুপের ট্রেনিং সম্পূর্ণ করা হয়েছে বিগত তিন বছরে।

প্রায় সারাদিন ধরে 'খাদেম বাহিনীর' শেষ গ্রুপের মহড়া দেখল খায়রুল কবীর। দশটা রাইফেল হাতে হাতে ঘুরছে ওদের। বিযুক্ত ইএমপি গানকে সাইট ও ম্যাগাজিনসহ দ্রুত সংযুক্ত করা, তারপর নিশানা ঠিক করে গুলি ছোঁড়া। এরপর স্মল আর্মস ও মেশিনগানের ব্যবহার, তারপর ছোরা ও কারাতে ফাইট, গ্রেনেড নিক্ষেপ, আরও কত কি! বোমা তৈরি এবং বিস্ফোরণ ঘটানোর ব্যাপারগুলোও

রয়েছে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে।

পরেরগুলো আসলে অর্থহীন, তাতে কোন সন্দেহ নেই তার, কেননা কাজ যা করার ইএমপি রাইফেল আর দূরপাল্লার কামানই করবে। ওগুলোর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। কিন্তু সন্দেহপ্রবণ মোল্লা কেরামতুল্লাহ্‌কে কথাটা বুঝতে দেয়নি সে। বুঝিয়েছে ওটার সাথে আর সব অস্ত্র অপারেট করাও শিখে রাখা দরকার। কখন প্রয়োজন হয়ে পড়বে কে জানে! আসলে চেয়েছে, কিছু একটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাক ওরা।

কাজেই ইএমপি গানের পাশাপাশি চোরাপথে কেরামতুল্লাহ্‌র জোগাড় করা রুশ ম্যাকারভ পিস্তল, একে ৪৭ ও আরপিডি সাব-মেশিনগান, সবই চালানো শিখছে এরা। এবং ভালই শিখছে এক্সপার্টদের তত্ত্বাবধানে। এখন যে-কোন রেগুলার সেনাবাহিনীর সাথেই লড়তে পারবে এরা।

এদের হাতে ইএমপি রাইফেল তুলে দিতে খায়রুল কবীরের আপত্তি নেই। কিন্তু আগে বুঝতে হবে এদের পরিণতি কি হতে চলেছে। যদি সে দেখে বাংলাদেশ আর্মির মোকাবিলা করার মত মনোবল এসে গেছে, তবেই দেবে। সেইসঙ্গে মাঠে নামাবে কামান সহ নিজের লোক। ট্রিগার মেকানিজম আসছে ওর বিশেষ সাবমেরিনে করে।

কেরামতুল্লাহ্‌র প্রতিটি ঘনিষ্ঠ সহযোগী জানে, বাংলাদেশের ক্ষমতা দখলের জন্য যোগ্য লোক বলেই যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে খায়রুল কবীরকে সুপ্রিম কমান্ডের তরফ থেকে। ইএমপি গানের আসাধারণ কার্যকারিতা দেখে প্রায় জবরদস্তি করেই নেতৃত্বের ভার চাপানো হয়েছে তার ওপর।

মেধা ও প্রতিভা, জন্মের সময় দুটোই নিয়ে এসেছে খায়রুল কবীর। সাথে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের গুণ এবং সমাজ বিরোধিতার পণও। 'আইন' নামে মানুষের প্রতিভাকে দমন করে রাখার যে শেকল আছে দেশে-বিদেশে, পিতা কবীর চৌধুরীর মত সে-ও তাকে মানে না। কারণ সুস্থ সমাজরক্ষার দোহাই দিয়ে তারা সত্যিকার প্রতিভাবানদের মেধা 'বিকাশে'র পথে বাধা সৃষ্টি করে, হাজারো নিষেধাজ্ঞার বেড়াজাল দিয়ে ঘিরে টেনে রাখে তাদেরকে মাঝারি পর্যায়ে।

এ চরম অন্যায়। সভ্যতা ও মানবতার প্রতি চরম অবমাননা। এসবের প্রতিবাদ করতে গিয়ে দেশছাড়া হতে হয়েছে কবীর চৌধুরীকে, খায়রুল কবীরকেও কম হেনস্তা হতে হয়নি। সেই ক্ষোভ জমে জমে চরম প্রতিশোধ নেয়ার স্পৃহা জন্মেছে তার ভেতরে। সেই থেকে উৎপত্তি এ পরিকল্পনার। ইএমপি গানের জন্মেরও সেটাই মূল কারণ ও উদ্দেশ্য। পুরো একটা বছর অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে তাকে ওটা আবিষ্কার করতে।

কাজটা শেষ হতে বাংলাদেশের ওপর নতুন করে নজর দেয় সে। নিজে উপস্থিত থেকে বড় ধরনের কোন পরিকল্পনা সফল করা তার পক্ষে সম্ভব, যদি সেটা স্বল্প মেয়াদের জন্য হয়। কিন্তু দীর্ঘ প্রস্তুতিপর্ব সমাধা করার সময় তার নেই। তাই চর লাগিয়ে এমন একজনকে খুঁজে বের করতে হয়েছে, যার মাথায় বুদ্ধি তো আছেই, বুকে ধর্ম ও পাকিস্তান-প্রেমের আগুনও আছে। এ ধরনের পাবলিক বাংলাদেশে সীমিত, তথ্যটা জানত সে, তাই স্থানীয় চরকে সেখানেই

উঁকি মারতে বলে দিয়েছিল।

একাধিক চর মাঠে নেমে টাকা ছড়াতে শুরু করে এবং অল্পদিনের মধ্যেই আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ' কেরামতুল্লাহ্‌র মধ্যে কাঙ্ক্ষিত 'প্রতিভা' আছে জানতে পেয়ে রিপোর্ট করে। কপাল ভাল, দেখা গেল কাজ অনেকদূর এগিয়েই রেখেছে লোকটা। সশস্ত্র হামলা করে ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা নিয়ে ড্রাগস ব্যবসার কোটি কোটি টাকা ঢালতে শুরু করেছে কয়েক হাজার ফ্যানাটিকের পেছনে। গড়ে তুলেছে একটা রাজনৈতিক দলও।

এরপর স্বয়ং খায়রুল কবীর মাঠে নামে, মাওলানার সঙ্গে দেখা করে প্রস্তাব দেয়–সে যদি একাত্তরের পারাজয়ের প্রতিশোধ এবং দেশের ক্ষমতা দখল করে এটাকে আবার প্যাকিস্তান বানাতে চায়, তাহলে সে সাহায্য করতে পারে। কি দিয়ে?

জিনিসটা দেখাল সে। কাজ কি, ক্ষমতা কেমন, সেটাও। চোখে স্বপ্ন ভর করল কেরামতুল্লাহর। এইবার তাকে পরামর্শ দিল খায়রুল কবীর, ঢিমে তেতালায় চলবে না, এখন থেকে আরও ব্যাপক হারে লোক ও অস্ত্র সংগ্রহ, তাদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে মাওলানাকে। অন্তত ত্রিশ হাজার খাদেম চাই।

কেরামতুল্লাহর জোগাড় করা অস্ত্রে প্রশিক্ষণ চলতে থাকবে, অন্যদিকে খায়রুল কবীর সেই ফাঁকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পর্যাপ্ত ইএমপি গান তৈরি করে নিয়ে আসবে। ওই জিনিস থাকতে অন্য অস্ত্রের কি দরকার? দরকার আছে, তাকে বুঝিয়েছে সে। যাদেরকে ক্ষমতা দখলের কাজে ব্যবহার করা হবে, তাদেরকে পরে যোগ্য পুরস্কার দিতে হবে না?

নিশ্চয়ই হবে, কিন্তু কিভাবে? সামরিক বাহিনীতে নিয়ে নেয়া হবে ওদের বেশিরভাগকে, বাছাই করা কয়েকজনকে নতুন প্রেসিডেন্টের (কেরামতুল্লাহ্‌র) ব্যক্তিগত গার্ড রেজিমেন্টের সদস্য করে নেয়া হবে। ওই রেজিমেন্টের সদস্যদেরও সব ধরনের অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ থাকা খুবই জরুরী। খুব খাঁটি কথা, এরপর আর কথা থাকে না। ফাটা বাঁশের মধ্যে পড়লে কি করে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে হবে, তা নিয়ে অনেক গবেষণার পর রাজি হলো কেরামতুল্লাহ।

কিন্তু তার কি লাভ? খায়রুল কবীর এসব করতে চাইছে কিসের আশায়? বিনিময়ে কি আশা করে সে? বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব এবং গবেষণার জন্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় ফান্ড, যাতে 'মানবকল্যাণে'র পিছনে মন দিতে পারে সে, নতুন নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে···

এরপর চাকা ঘুরতে বেশি সময় লাগেনি। লোকটার প্রস্তাবে এক কথায় রাজি হয়েছে কেরামতুল্লাহ্। ব্যস্, শুরু হয়ে গেল। এক বছর পর কিছু স্যাম্পলসহ পরিস্থিতি দেখতে এলো খায়রুল কবীর। এবং সবাইকে একেবারে মুগ্ধ করে দিয়ে গেল। ইএমপি রাইফেলের কাজ দেখে একেবারে স্পীকটি নট্ হয়ে গেল কেরামতুল্লাহ ও তার দলের হাই কমান্ড।

এরপর থেকে তার ওপর সহজাত কর্তৃত্বের প্রভাব খাটাতে শুরু করল সে

একটু একটু করে। একেবারে তার কেনা গোলাম বনে গেল কেরামতুল্লাহ্। খায়রুল কবীর যদি দিনকে রাত বলে, সে-ও বলে রাত। রাতকে দিন বললে সে-ও বলে তাই। কিন্তু সে বোঝে, এত ভাল ভাল না। কেরামতুল্লা যেমন সন্দেহ করে, আরও কোনও গভীর মতলব আছে বিজ্ঞানীর; খায়রুল কবীরও জানে, শুধু জানে না, হলফ করে বলতে পারে, তাকে প্রথম সুযোগেই ছোবল মারার তালে আছে মাওলানা।

প্রথম থেকেই এ ব্যাপারে একশো ভাগ নিশ্চিত সে। জানে, সময়মত তাকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে লোকটা। আর করুক চাই না করুক, সে তা দেখার অপেক্ষায় থাকবেও না। তাই অনেক সতর্কতার সঙ্গে নিজের কাজ করে গেছে। নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে সে পাকিস্তানে বসে। ঠিক সময়মত আসবে তার লোক সাবমেরিনে করে, জান উড়ে যাবে মাওলানার খাঁচার পাখিদের ওদের একেকজনের হেভিওয়েট তেলেসমাতি কারবার দেখে।

ফাইনাল অ্যাকশন শুরু হওয়ার ঠিক সাতদিন আগে বঙ্গোপসাগরে পৌঁছবে সাবমেরিন, তার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে আন্তর্জাতিক জল-সীমানায়। পেলেই এগিয়ে আসবে। এ তো কিছুই নয়, এসব ছাড়াও আরও অনেকগুলো চমক আছে তার থলিতে।

ভাবনার রাশ টেনে ধরল সে, পরের ব্যাপার পরে। শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে হলে যা-যা জরুরী, এখন সেদিকে কড়া নজর রাখতে হবে।

পাঁচ

গভীর রাত। বাইরে ঝড়বৃষ্টির তোড় কমে এসেছে। রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা।

ওরই মধ্যে কে-কে ভবনের দশতলায় গুরুত্বপূর্ণ এক বৈঠক বসেছে মাওলানা কেরামতুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে। অন্যমনস্ক সে। মুখে সুগন্ধী পান, থেকে থেকে জাবর কাটার মত চোয়াল নড়ছে। তার সাথে তাল মিলিয়ে নাচছে থুত্‌নির দাড়ির গোছা। মাথাও নড়ছে একটু একটু।

ভাবছে সে। সন্ধের পর দারুণ এক আইডিয়া এসেছিল মাথায়। ইতির রক্ষাকর্তার পরিচয় বের করার মোক্ষম আইডিয়া। মহাখালির ওই বাড়িটায় গাড়িতে চড়ে কেউ একজন এসেছে শোনার পর কেরামতুল্লাহ্‌র মনে হলো, ও কাদের সাথে হাত মিলিয়েছে, তা জানার সহজ এক উপায় আছে।

সেটা হচ্ছে ইতির মোবাইল টেলিফোন। গত কয়েকদিনে ওটার সাহায্যে সে কোন্-কোন্ নম্বরের সাথে কথা বলেছে, সেটা জানা গেলেই লোকটার পরিচয় জেনে নেয়া যাবে। অন্তত সূত্র তো একটা মিলবে। তথ্যটা জানার খুব সহজ একটা উপায়ও ছিল।

ইতির ওটা যে কোম্পানির, তার রেকর্ড সেকশনের ডেপুটি চীফ তার ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত লোক। সঙ্গে সঙ্গে ওখানে ফোন করে নাম্বারটা দিয়ে সে কি চায়

জানিয়ে দেয় তাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাঠে মারা গেছে তার আইডিয়া।

তাকে জানানো হয়েছে, গত সপ্তাহখানেক ইতি যে সমস্ত নম্বরে ফোন করেছে, তার একটা ওদের বাসার ফোন, আর একটা বান্ধবীর। বাকি ছিল একটা, সেটা আনলিস্টেড। টিঅ্যান্ডটির তালিকায় ওটার উল্লেখ নেই।

ওদিকে ব্যর্থতা, কয়েকদিনের মধ্যে তার গুরুত্বপূর্ণ 'প্রচারণা অভিযান' শুরু করার কথা, এই ঝামেলায় সেটাও হয়তো পিছিয়ে যাবে। তারওপর এদিকে···সামনে বসা শমশের আলি ও কুদরতুল্লাহ্‌কে দেখল সে। জানে, যা ঘটে গেছে তার দায় এদের ঘাড়ে চাপানো ঠিক হবে না। অসম্ভব না হয়ে উঠলে যার যার কাজ ওরা ঠিকই সেরে আসতে পারত। দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির কারণে ব্যর্থ হয়েছে দু'জনে। কিন্তু এভাবে তো চলতে পারে না।

শমশের আলির দিকে তাকাল সে। নাকের ডগা চুলকাচ্ছে আপনমনে। দৃষ্টি স্থির, পলক পড়ছে না চোখে।

লোকটা অপরাধীর মত নতমুখে বসা। চুল একটু একটু ভেজা। কিছুক্ষণ আগে ফিরেছে সে মহাখালি থেকে। তার পাশে বসা ছোট ভাই কুদরতুল্লাহ্। বড় ভাইয়ের সাথে চেহারায় কোন মিলই নেই তার। লোকটা খাটো, গাট্টাগোট্টা। কুতকুতে দু'চোখ সবসময় ঢুলুঢুলু থাকে। দেখতে লাগে চোয়াড়ের মত।

'তাহলে?' কেরামতুল্লাহ্ বলল জাবর কাটা থামিয়ে। 'শেষ করে রেখে আসতে পারলেন না ও দুটোকে?'

জবাব দিল না শমশের আলি, একবার চোখ তুলেই নামিয়ে নিল। ভেতরে ভেতরে ভয়ে কাঁপছে। মাওলানার চাউনি ভাল ঠেকছে না, এ মুহূর্তে স্বাভাবিকের চেয়ে বহু গুণ ঠাণ্ডা তার চোখ দুটো। লোকটা যখন কাউকে আল্লাহ্‌র নামে কোরবানি করার নির্দেশ দেয়, তখন এরকম হয়ে ওঠে চাউনি। এবং সে কথা শমশের আলিই সবচেয়ে ভাল জানে।

ভাইয়ের দিকে ফিরল কেরামতুল্লাহ্। 'আর তুমি, তোমার লোকেরাও ব্যর্থ।' প্রশ্ন নয়, মন্তব্য করল সে। কণ্ঠে তিক্ততা।

'ওই লোকগুলো আগে থেকেই ওখানে ছিল,' দুর্বল গলায় কৈফিয়ত দিল সে। 'ওদের ধারণা পুলিস ছিল তারা। নয়তো ব্যর্থ হওয়ার কোন কারণ ছিল না। নিজেদের কাজ···'

এক হাত তুলে বাধা দিল সে। 'অনুসরণ করা হয়নি তো গাড়িটাকে?'

'না, না!' দ্রুত মাথা নাড়ল কুদরতুল্লাহ্। 'তেমন কিছু ঘটেনি। ওদের গাড়ি ছিল না।'

ইন্টারকম বেজে উঠতে রিসিভার তুলল কেরামতুল্লাহ্। 'জ্বি!' বলে ওপ্রান্তের বক্তব্য শুনে মাথা দোলাল। 'ঠিক আছে, আসতে দিন।'

একটু পর উঠে গিয়ে দুই আগন্তুককে অভ্যর্থনা জানাল দরজা খুলে। তাদের একজন বেশ লম্বা-চওড়া। গালে চাপ দাড়ি, ছোট করে ছাঁটা। গোলগাল মুখ, ফরসা। পরনে শার্ট-প্যান্ট, পায়ে দামী, চকচকে শু। অন্যজন জলহস্তীর খুদে সংস্করণ। দৈর্ঘ্যে যা, প্রস্থে তার প্রায় দ্বিগুণ। তিনটে ভাঁজ থুত্‌নিতে, আরও একটা পড়ে পড়ে অবস্থা। ক্লীন শেভড্। পাজামা-পাঞ্জাবী পরে আছে সে, পায়ে স্যান্ডেল

শূ। সাড়ে তিনশো পাউন্ডের বেশি হবে তার ওজন।

হেঁটে নয়, ঠিক যেন ড্রামের মত গড়িয়ে গড়িয়ে এলো লোকটা। চোখ-মুখের অবস্থা দেখে মনে হয় আরামের বিছানা ছেড়ে উঠে আসতে হয়েছে তাকে বাধ্য হয়ে। চোখে বাসি সুরমার চিহ্ন। কেরামতুল্লার নীরব ইঙ্গিতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল তার ভাই শমশের আলিকে নিয়ে।

সালাম ও কুশল বিনিময় সেরে বসল লোক দুটো। এরা রাজনীতিক এবং কোটিপতি ব্যবসায়ী। কোটি-কোটিপতি। যখন যে সরকার আসে, তখনই তার সাথে ভিড়ে যাওয়ার সুখ্যাতি আছে এদের। দফায় দফায় মোটা চাঁদা ও এটা-সেটা দিয়ে দলের নেতাসহ প্রভাবশালীদের অন্তরে জায়গা করে নেয় অল্পদিনের মধ্যেই।

অবশ্য যা দেয়, লাইসেন্স-পারমিট বাগিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার বহু গুণ তুলেও নেয়। তার থেকে কিছু বিলিয়ে দিয়ে আসে গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ বিশেষ জায়গায়। পরে এর সুফল পাওয়া যায়। উঁচু পর্যায়ে তো বটেই, এমনকি সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়েও যখনই কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, সঙ্গে সঙ্গে তা জানা হয়ে যায় এদের। ঢাকার প্রত্যেকটা থানায় ইনফর্মার আছে, কাজেই পুলিসের সমস্ত তৎপরতার খবরও তাদের নখদর্পণে।

মোট কথা দেশের হাঁড়ির খবর কিছুই অজানা থাকে না এই দুজনের। সবই আপ-টু-ডেট থাকে প্রতিমুহূর্তে। প্রথমজন খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানীকারক। ইদানীং প্রাইভেট বিমান কোম্পানিও খুলেছে একটা। অন্যজনের সাদা পরিচয়, দেশের দুই প্রধান জনশক্তি রফতানীকারী সংস্থা, গোটা সাতেক বড় বড় গার্মেন্টস, একটা ইলেক্ট্রিক্যাল সামগ্রী প্রস্তুতকারী কোম্পানিসহ ইত্যাদি ইত্যাদির মালিক সে।

এরা দু'জনেই মাওলানা কেরামতুল্লাহ্‌র ঘনিষ্ঠ বন্ধু, অন্ধ সমর্থক ও পরামর্শদাতা। আদর্শের দিক থেকেও তার মতই পাকিস্তানের অন্ধ ভক্ত। তার যে-কোন নির্দেশ বিনা প্রশ্নে পালন করে থাকে। কাছাকাছি বয়স তিনজনেরই।

'এত জরুরী তলব, ব্যাপার কি?' জলহস্তী প্রশ্ন করল। কপালে আর গর্দানে চকচক করছে ঘাম।

'জরুরী পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে,' কেরামতুল্লাহ্ বলল দাড়িতে হাত বুলিয়ে। 'সমস্যা।'

'তোমার সেই মেয়েটা…?'

'হ্যাঁ।'

'এখনও বাঁচিয়ে রেখেছ ওকে?' ভুরু কুঁচকে বদ চেহারা আরও বদ করে তুলল জলহস্তী।

মহাখালির ঘটনা ব্যাখ্যা করতে শুরু করল মাওলানা। নীরবে শুনল লোক দুটো। তারপর একযোগে দু'জনেই মাথা নাড়ল। 'অসম্ভব!' চাপ দাড়ি বলল জোর দিয়ে। 'তোমাকে সন্ধ্যায় যা বলেছি, এখনও তাই বলছি, পুলিস এর সাথে কোনমতেই জড়িত নেই। আমরা দু'জনেই যার যার সোর্সের কাছে খবর নিয়েছি। তেজগাঁ পুলিস কিছু জানে না। কেবল মহাখালির কোথাও গুলির আওয়াজ শোনা গেছে, এই পর্যন্তই জানে তারা। ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

মোটার দিকে ফিরল চিন্তিত কেরামতুল্লাহ্। 'তোমার সোর্সও একই কথা বলে, তাই না?'

'হ্যাঁ। খুব ভাল মত চেক্ করে দেখেছি আমি। শুধু পুলিস কেন, এসবি, ডিবি, এনএসআই সহ যত সংস্থা আছে, তারাও এ-ব্যাপারে কিছু জানে না। আমি লোক লাগিয়ে দিয়েছি বাড়িটার মালিকের খোঁজ জানার জন্যে। ওটা জানা গেলেই বোঝা যাবে...'

'চিন্তার কথা!' বিড়বিড় করে বলল কেরামতুল্লাহ্। 'কতক্ষণ লাগতে পারে ওদের?'

'বলতে পারছি না, সময় তো কিছু লাগবেই। তবে রাতের মধ্যেই খবর বের করে ফেলতে পারবে ওরা। আশা করি।'

'দু'দিন পর ঢাকায় আসছে কে-কে,' মাওলানা বলল। 'এই খবর শুনলে নিশ্চয়ই খেপে যাবে লোকটা। কি বলে যে তাকে বুঝ দেব ভেবে পাচ্ছি না।'

'তাকে বলার দরকার কি?' বলল প্রথমজন। 'এ আমাদের সমস্যা, আমরাই সময়মত মিটিয়ে ফেলব। তাকে শুধু শুধু...'

'না,' মাওলানা বাধা দিল। 'এই শেষ মুহূর্তে কোনকিছুই তার কাছে গোপন রাখা ঠিক হবে না। যদি রাখা হয়, আর সে তা নিজের সোর্সের মাধ্যমে জেনে ফেলে, তাহলে আমরা কঠিন সমস্যায় পড়ব। আমাদের কার্যক্রমে দুর্বলতা আছে অভিযোগ তুলতে পারে কে-কে। তুলতে পারে না, আমার ধারণা তুলবেই। এমনকি নিরাপত্তার অজুহাত তুলে আমাদের সাহায্যও হয়তো বন্ধ করে দেবে। খোদা না খাস্তা, তেমন কিছু ঘটলে এক ধাক্কায় অন্তত পাঁচটা বছর পিছিয়ে যাব আমরা। সবকিছু আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হবে। নাহ্, সব জানাতে হবে তাকে।'

'কিন্তু মাল তো শুনলাম চট্টগ্রাম পোর্টে পৌঁছে গেছে,' বলল দ্বিতীয়জন। 'এখন আর চিন্তা কিসের? কাল-পরশু ওগুলো ছাড় করালেই তো হয়ে গেল।' সমর্থনের আশায় আমদানীকারক বন্ধুর দিকে তাকাল হিপোপটেমাস মোটা গর্দান ঘুরিয়ে। সে-ও মাথা দোলাল।

হাসির ভঙ্গি করল কেরামতুল্লাহ্, বিচ্ছিরি শব্দ করে মুখের পান, থুতু পিকদানীতে ফেলে দাগপড়া রুমালে ঠোঁট মুছল। 'তোমাদেরকে ভেতরের একটা খবর জানানো হয়নি এতদিন। সেটা শুধু আমি জানি, আর জানে কে-কে। তোমরাও জেনে রাখো, জাহাজে যা আছে, শুধু তাই দিয়ে কাজ হবে না।'

বোমাটা ছেড়ে চুপ করে বসে থাকল সে, একে একে দুজনের মুখের দিকে তাকাল, যেন বিস্ফোরণ-পরবর্তী প্রতিক্রিয়া দেখছে।

'কেন হবে না?' কুমড়ো প্রশ্ন করল। বিস্ময়ে চোয়াল ঝুলে পড়ায় চেহারাখানা হয়েছে দেখার মত।

'কারণ ওগুলোর সঙ্গে আসল যে জিনিস, সেই ট্রিগার মেকানিজম নেই। ওটা আনেনি কে-কে।'

'ইন্নালিল্লাহ্! কেন?' প্রায় আঁতকে উঠল দ্বিতীয়জন।

'কারণ একটাই, আমার ধারণা লোকটা আমাদের ওপর পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারছে না। সোজা কথায় বিশ্বাস করতে পারছে না আমাদেরকে।

ট্রেনিঙের জন্যে কয়েকটা কমপ্লিট ইএমপি গান দিয়েছিল সে, এখন পর্যন্ত ওই ক'টাই আমাদের সম্বল। আর আছে আমাদের নিজেদের অস্ত্র যা ছিল। কিন্তু ওগুলোর একহাজারটা যা না করতে পারবে, একটা ইএমপি গান পারবে তারচেয়ে একশোগুণ বেশি। লোক লাগবে অল্প, অথচ কাজ হবে অনেক তাড়াতাড়ি।'

'তাহলে, ট্রিগার...'

'ওগুলো একেবারে শেষ মুহূর্তে হাতে পাব আমরা।'

'এর কি প্রয়োজন ছিল আমার তো মাথায় আসছে না,' রাগ রাগ গলায় বলল লোকটা। 'আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি ভেবে যদি এ কাজ করে থাকে কে-কে, তাতে লাভ কি? সে কাজ তো আমরা তখনও করতে পারি।'

নতুন এক খিলি পান তুলে নিল মাওলানা, মুখে পুরে কয়েক কামড়ে ওটাকে বাগে এনে বলল, 'হয়তো তার ধারণা তেমন কিছু ঘটলে সে তখন কোনভাবে বাধা দিতে পারবে। প্রথমদিনই তাকে চিনেছি আমি: যেমন প্রতিভাবান, তেমনি ধূর্ত। তাছাড়া তখন সে নিজেও থাকছে আমাদের সাথে।'

বিজ্ঞানীরা ধর্ম-কর্ম মানে না, ভাবল কেরামতুল্লাহ্, কে-কেও তাই। এক কথায় নাস্তিক। ওদের ভাষায় 'মোল্লাকে' সাহায্য করার গরজ তার থাকার কথা নয়। তবু করছে, কেন? নিজের স্বার্থ আছে বলে। সেটা কি, শুধুই ক্ষমতার একটা অংশ? না পুরোটাই? নাকি সম্পূর্ণ ভিন্ন আর কিছু?

কে-কের সাথে তার কয়েক দফা বৈঠক হয়েছে। এ দেশের প্রতি তার যে প্রচণ্ড আক্রোশ আছে, ঘৃণা আছে, লোকটার হাবে-ভাবে, কথাবার্তায় তা ঠিকই বুঝতে পেরেছে কেরামতুল্লাহ্। বাংলাদেশকে উচিত শিক্ষা দেয়ার একটা সুযোগ খুঁজছে সে, প্রতিশোধ নিতে চাইছে। এই জন্যেই সেধে কেরামতুল্লাহ্কে সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছে। বিনিময়ে ক্ষমতার 'ভাগ' চেয়েছে। কিন্তু তার কিছুতেই বিশ্বাস হতে চায় না মানুষটা শেষ পর্যন্ত ভাগে সন্তুষ্ট হবে। হয়তো...

সময়মত তাকে ঠেকানোর প্ল্যান আগেই করে রেখেছে মাওলানা। ঠিক করল, ওটাকে আরেকটু ঘষামাজা করে চোখা বানাতে হবে. তারপর ট্রিগারের চালানটা পৌঁছলে...

'তাহলে এখন কি করব আমরা?'

'যা করছিলাম, তাই,' মাওলানা বলল। 'তোমরা দু'জন মিলে চেষ্টা করো বাড়িটার মালিকের খোঁজ বের করার। তাড়াতাড়ি। আমার মনে হয় এখন আমি জানি ওটা কার, মানে কাদের। কিন্তু নিশ্চিত হতে হবে।'

'কাদের?' প্রশ্নটা না করে পারল না মোটা পরামর্শদাতা।

'বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের।'

একটু বিচলিত হতে দেখা গেল মোটাকে। তাই দেখে মাওলানা যোগ করল, 'ঘাবড়াবে না। ঘাবড়াবার কোন কারণ ঘটেনি। কেউ আমাদের বিরুদ্ধে একটা আঙুলও যাতে তুলতে না পারে, সে ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি।'

'কিন্তু ওই ফাইল, খাদেমদের নামের তালিকা!' চাপ দাড়ি বলল ভীত চেহারায়। 'ওটি যদি...'

'কিসের ফাইল? কোন্ তালিকা?' হাসিমুখে মাথা নাড়ল কেরামতুল্লাহ্। 'ওটা

যে এখান থেকেই নেয়া হয়েছে, কেউ তা প্রমাণ করতে পারবে না, নিশ্চিন্ত থাকো। এবার যাও তোমরা। বিসিআই সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জানাও আমাকে। আমি অপেক্ষায় থাকলাম।'

দরজা পর্যন্ত গিয়ে তাদের বিদায় জানাল মাওলানা, ফিরে এলো বাইরে থেকে আগের দুজনকে নিয়ে। 'যা বলছিলাম,' শুরু করল সে, 'অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে এখন মেয়েটার আশা বাদ দিতে হচ্ছে আমাদেরকে। ওর বাপ-মাও আপাতত বাদ। ও কাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, এখন সেটাই জানতে হবে সবচেয়ে আগে।'

খাদেম শমশের আলির দিকে ফিরল সে। 'আজই প্রথম কোন দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন আপনি। সে জন্যে আপনাকে দোষ দিই না, পরিস্থিতির কারণে ঘটেছে ব্যাপারটা। কিন্তু আর ব্যর্থ হলে চলবে না। কথাটা বুঝতে পেরেছেন আপনি?'

'জ্বি, হুজুর।'

মাথা দোলাল কেরামতুল্লাহ্। 'পারলেই ভাল। এ মুহূর্তে আমাদের যা অবস্থা, তাতে প্রতিটা পদক্ষেপে নির্ভুল, হিসেবী হতে হবে। এক চুল এদিক-ওদিক হওয়ার জো নেই। মহাখালিতে যারা ওই বাড়ির ওপর নজর রাখছে, তাদের ফিরে আসতে বলুন। দরকার নেই নজর রাখার। আর তুমি,' বলে ভাই কুদরতুল্লাহ্‌র দিকে ফিরল সে, 'ইতিদের বাড়ির ওপর যে-ক'জন নজর রাখছে, তাদেরকেও ফিরে আসতে বলে দাও।'

ঢুলুঢুলু চোখে ভাইকে দেখল কুদরতুল্লাহ্। 'জ্বি।'

'কাজটা সেরেই টঙ্গী চলে যাও তুমি। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে গাড়িটার গা থেকে ক্লিনিকের ছাপ তুলে ফেলার ব্যবস্থা করবে। কাজে কোনরকম খুঁত যেন না থাকে।'

'জ্বি।'

আবার শমশের আলির দিকে নজর দিল কেরামতুল্লাহ্। প্রায় বিশ মিনিট ধরে একনাগাড়ে বলে গেল তার পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে। তারপর দু'জনকে বিদায় দিয়ে কোথাও কোন ভুল হয়েছে কি না, বা গুরুত্বপূর্ণ কোন পয়েন্ট তার নজর এড়িয়ে গেছে কি না, আগাগোড়া ভেবে দেখল একবার ভাল করে।

নাহ্, সব ঠিকই আছে। কোথাও ভুল নেই। ইতির তথ্যচুরির ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে বসল এবার।

রাত দুটোর একটু পর টেলিফোনের শব্দে তন্দ্রা ছুটে গেল মাওলানার। জরুরী অবস্থা বলে আজ বাসায় যায়নি সে, অফিসেই রয়ে গেছে। সামনে রাখা তার মোবাইল ফোনটা বাজছে। তুলল সে ওটা। 'জ্বি!' সোজা হয়ে বসল।

চোখ কুঁচকে মন দিয়ে শুনছে। এক মিনিট পর মাথা দুলিয়ে দাড়ির নিচে থুতনি চুলকাল। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'মা-সু-দ রা-না! কোন ভুল হয়নি তো লোকটার?...আচ্ছা, আচ্ছা...ঠিক আছে। আমি করছি যা করার।'

লাইন কেটে হেলান দিয়ে বসল কেরামতুল্লাহ্। দৃষ্টি অনড়, ভয়ঙ্কর রকম ঠাণ্ডা।

ছয়

লালমাটিয়া। সকাল ন'টা।

পাকস্থলীতে মৃদু সুড়সুড়ি জাতীয় অনুভূতি নিয়ে বাসা ছেড়ে বের হলো মাসুদ রানা। গেট দিয়ে বেরিয়ে এসে বড় রাস্তায় ওঠার আগে ডানে তাকিয়ে ট্রাফিক পরিস্থিতি দেখে নিল এক পলক, তারপর বাঁয়ে টার্ন নিল। সাত মসজিদ রোড ধরে মতিঝিলের উদ্দেশে ছুটল।

এত তাড়াতাড়ি সাধারণত অফিসে যায় না ও, কিন্তু আজ অনেকগুলো জরুরী কাজ আছে বলে বেরোতে হলো। কাজের চিন্তা ঘুরছে মাথায়, তাই ডানদিকে, ওর বাড়ির গেট থেকে দেড়শো গজ দূরে মোটর সাইকেলে বসা দুই যুবককে খেয়ালই করল না। ইগনিশন লক্ অবস্থায় স্টার্টারে কিক্ করছিল সামনের জন, ভান করছিল গোলমাল দেখা দিয়েছে এঞ্জিনে।

রানা বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে দেখে থামল সে, পিছনেরজন তার আগেই মুঠোয় ধরা মোবাইল ফোনের বাটন টিপতে শুরু করে দিয়েছে। প্রার্থিত নম্বরে রিং হলো, সাড়া এলো, 'শুনছি।'

'যাচ্ছে,' বলে লাইন কেটে দিল সে। মৃদু খোঁচা দিল সামনের যুবকের পিঠে। 'চলো।'

চাবি ঘোরাল সে, এক কিকেই স্টার্ট নিল হোন্ডা। দ্রুত ছুটল রানার পিছন পিছন। আবাহনীর মাঠের কাছে এসে রানার ত্রিশ গজ পিছনে গতি স্থির করল চালক, সমান তালে এগিয়ে চলল। ওদিকে রানার মাথায় ঘুরছে গতরাতের চিন্তা। গুলির খোসাগুলো কালই বিসিআইয়ে পৌঁছে দিয়েছিল ও পরীক্ষা করার জন্যে। ইতিকেও সরিয়ে ফেলেছে।

কিন্তু দুশ্চিন্তা যাচ্ছে না। রাতে ভাল ঘুম হয়নি, তারওপর এই সুড়সুড়ি জাতীয় অনুভূতি, এটাও ভাল ঠেকছে না ওর কাছে। মনে হচ্ছে নতুন কিছু ঘটতে যাচ্ছে, ভয়ঙ্কর কিছু। এসব পরোয়া করে না রানা, ভয় শঙ্কা আর বিপদ, এই নিয়েই ওর জীবন। এসবের মধ্যেই এতবছর কাটিয়ে এসেছে। কাটাবে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু এখন পরিস্থিতি অন্যরকম। সুবিধের মনে হচ্ছে না।

কেরামতুল্লাহ্ সম্পর্কে ইতির মুখে প্রথমদিন যেসব কথা শুনেছে, তাতে ও মোটামুটি সেদিনই নিশ্চিত হয়ে গেছে যে বড় ধরনের কোন পরিকল্পনা আছে লোকটার মাথায়। সেটাও নতুন কিছু নয়, একাত্তরে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে বিশেষ কয়েকটা মহল অনেকবার অনেকভাবেই চেষ্টা করেছে দেশের ক্ষতি করার, স্বাধীনতাকে ধূলিসাৎ করে দেশকে পাকিস্তানের দাস বানাবার। যুক্তি ছিল না, ছিল শুধু ধর্মের দোহাই।

কাজ হয়নি, কারণ সাধারণ মানুষকে ভুলিয়ে ভালিয়ে পাকিস্তানে ফেরত যাওয়ার টোপ গেলানো কঠিন। এদেশের মানুষ জানে পাকিস্তানী শোষণ কাকে

বলে, বুঝে গেছে স্বাধীনতার মাজেজা। তাই বরাবর তারা প্রত্যাখ্যান করেছে ওদেরকে। হাওয়া বুঝে তারাও হাত গুটিয়ে নিয়েছে কিছুদিনের জন্যে। নতুন কৌশলে আবার একদিন এগিয়েছে, আবারও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। কিন্তু এবারের কথা আলাদা। কাল যে বিস্ময়কর অত্যাধুনিক অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে মহাখালিতে, এ জিনিস যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে মহলটার হাতে, তাহলে যে-কোন মুহূর্তে চরম সর্বনাশ ঘটে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

ওরা এবার এদেশের মানুষকে পরোয়া করবে না, নিজেদের ইচ্ছেমত কাজ করবে। স্বভাবতই একটা উদ্দেশ্য নিয়েই এগোবে ওরা: যেমন করে হোক, ক্ষমতা দখল। তাতে যদি ওরা সফল হয়, তাহলে অন্তত একশো বছর পিছিয়ে পড়বে বাংলাদেশ। কাজেই খুব তাড়াতাড়ি এর বিহিত করতে হবে।

ব্যর্থ হলে খুব শীঘ্রি হয়তো দ্বিতীয় আফগানিস্তান হবে দেশ, বেধে যাবে ভয়ঙ্কর গৃহযুদ্ধ । মানুষের রক্তে ভিজে উঠবে দেশের মাটি। তাই কেরামতুল্লাহ্‌কে ঠেকাতেই হবে, ভাবল রানা, মোড় ঘুরে এলিফ্যান্ট রোডে পড়ল আগের রাতের বৃষ্টির জমে থাকা পানি ছিটিয়ে।

তখনই খেয়াল করল পিছনের দুই হোন্ডা আরোহীকে, তারাও ঘুরেছে। চোখ নামিয়ে ড্রাইভিঙে মন দিল ও। ভুরু কুঁচকে উঠল আপনাআপনি। এরা না···! বাটা ক্রসিঙে পৌঁছল রানা, শাহবাগের দিকে এগোল। আইল্যান্ডের কাছে পৌঁছে রমনার দিকে না গিয়ে হঠাৎ বাঁয়ে ঘুরে গেল সন্দেহ যাচাই করার জন্যে। হোন্ডাও ঘুরল।

ব্যাপারটা কাকতালীয়ও হতে পারে ভেবে সোনারগাঁ হোটেলের সামনের ফোয়ারা ঘুরে আবার শাহবাগের দিকে এগোল ও। হ্যাঁ, এখনও আছে। নিশ্চিত হলো রানা। শুধু লেগেই নেই, পিছনের যুবক থেকে থেকে মুখের কাছে হাত তুলে কি যেন করছে।

সকালের অফিস যাত্রীদের 'রাশ' এখনও কাটেনি, রাস্তায় প্রচুর গাড়ি–বাস, মিনিবাস, ট্যাক্সি-ক্যাব, স্কুটার ও মিশুক। ওর মধ্যেই বেপরোয়া হয়ে উঠল রানা, আচমকা গ্যাস পেডাল চেপে ধরল। জোর এক দোল খেয়ে লাফিয়ে উঠল ওর টয়োটা স্প্রিন্টার, ফাঁক-ফোকর বের করে ছুটল বিপজ্জনক গতিতে। দেখতে দেখতে মগবাজার ক্রসিং ছাড়িয়ে শেরাটনের কাছে এসে পড়ল রানা, অন্যদের চরম বিরক্তি ও খিস্তি উপেক্ষা করে একেবারে শেষ মুহূর্তে বাঁয়ে ঘুরে গেল। পিছনে অসংখ্য গাড়ির ব্রেক কষার শব্দে খাড়া হয়ে গেল এলাকা।

সেদিকে তাকাবার সময় নেই ওর, শেরাটন ছাড়িয়ে ফাঁকা পেয়ে মিন্টো রোড ধরে তীরবেগে ছুটল ইস্কাটনের দিকে। রিয়ার ভিউ মিররে দেখল অনেক পিছনে পড়ে গেছে হোন্ডা। চালক বেচারা বুঝতেই পারেনি শেরাটনের কাছে এসে তাকে ওরকম ঘোল খাওয়াবে রানা। তাই বাঁক নিতে একটু দেরি করে ফেলেছে। তবে পিছু ছাড়েনি, ব্যবধানটা কমানোর চেষ্টা করছে এখন মরিয়া হয়ে। সুযোগ দিল না ও, অফিসার্স ক্লাবের সামনে দিয়ে ডানে মোড় ঘুরে দ্রুত এগোল কাকরাইলের দিকে, চীফ জাস্টিসের বাড়ির সামনের আইল্যান্ড ঘুরে হেয়ার রোড ধরল। ওটা পেরিয়ে আবার শেরাটন হয়ে উঠল ময়মনসিংহ রোডে। বারডেম পর্যন্ত এসেও

যখন অনুসরণকারীদের দেখতে পেল না, তখন ভদ্র গতিতে গাড়ির স্রোতে ভাসিয়ে দিল নিজেকে।

তবে সরাসরি মতিঝিলের দিকে না গিয়ে অনেকটা পথ ঘুরে পৌঁছল। পিছনে কড়া নজর রেখেছিল, কিন্তু আর দেখতে পায়নি ওদেরকে। খসে গেছে। চিন্তিত মনে অফিস বিল্ডিঙের প্রায় নির্জন আন্ডারগ্রাউন্ড কার পার্কিং এরিয়ায় ঢুকল, লিফটের পিছন দিকে চলে এলো ঘুরে। নিজের শূন্য স্লটে ব্যাক করে গাড়ি ঢোকাল, বেরিয়ে এসে লক্ করল। চাবি পকেটে ছেড়ে দিয়ে এগোল লিফটের দিকে।

কয়েক পা মাত্র এগিয়েছে, এমন সময় লিফটের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এলো দুই যুবক। প্রায় ওরই সমান বয়স, পরনে শার্ট-প্যান্ট, জুতো। একজনের শার্ট ইন করা। প্রায় কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল তার। ঘন, রেশমী এবং কোঁকড়া। অন্য জনের চুল ছোট করে ছাঁটা, তার গায়ের রঙের মতই বাদামী। এতই বাদামী যে ভাল করে না তাকালে দূর থেকে যে কেউ ভাববে পুরো মাথাজোড়া টাক বুঝি। একটু খাটো সে, অন্যজন রানার কান সমান।

অন্য সময় হলে বিশেষ খেয়াল করত না হয়তো, কিন্তু রাস্তায় ঘটে যাওয়া ব্যাপারটার কথা ভেবে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন মনে করল রানা। মনে পড়ল, অনুসরণকারীদের একজনকে একটু পর পর মুখের কাছে হাত নিয়ে কিছু একটা করতে দেখেছে ও। হয়তো মোবাইল ফোনে কথা বলছিল সে এদের সাথে, রানিং কমেন্ট্রি দিচ্ছিল।

দাঁড়িয়ে পড়ল ও, যেন গাড়িতে কিছু ফেলে এসেছে, পকেট চাপড়ে এমন ভাব করে ঘুরে দাঁড়াল। ডান হাত উঠে গেছে শোল্ডার হোলস্টারের দিকে, কিন্তু শেষ করতে পারল না কাজটা। তার আগেই ওর বাঁ দিকের এক পিলারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো আরেক লোক। হাতে পিস্তল।

ওকে থমকে যেতে দেখে হাসল লোকটা, ওপরের পাটির একটা সোনার দাঁত ঝিক্ করে উঠল। 'ওই কাজটা করবেন না দয়া করে,' নিজেরটা দোলাল সে। 'আমাকে দিন ওটা। কিন্তু খুব সাবধানে। একটু এদিক-ওদিক দেখলেই...'

চোখ কুঁচকে উঠল ওর। একটু বয়স্ক এই লোক, লম্বায় রানার সমান। পরনে ঢোলা প্যান্ট ও টি-শার্ট। পিস্তল ধরার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায় ভাল ট্রেনিং পাওয়া।

'কি চাও তোমরা!' কঠিন গলায় প্রশ্ন করল রানা। ব্যাটাদের স্পর্ধা দেখে তাজ্জব বনে গেছে। মতিঝিলের ব্যস্ততম ভবনগুলোর অন্যতম এটা, কারপার্কে প্রায় সারাক্ষণই গাড়ি আসছে-যাচ্ছে। তারওপর গেটে রয়েছে সিকিউরিটি গার্ড, এর মধ্যে ব্যাটারা দল বেঁধে এসেছে...আড়চোখে প্রথম দুজনকে দেখে নিল ও। আলাদা হয়ে গেছে তারা পরস্পরের কাছ থেকে, ওর ডান ও বাঁ দিক থেকে আসছে, কোনাকুনি।

'কারা তোমরা?' সময় নষ্ট করতে চাইছে রানা। বুঝতে পারছে পিছনের দু'জনের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র নেই, থাকলে কাছে আসার দরকার হত না তাদের, দূরেই থাকত। অথবা হয়তো আছে, তবে...

'ভার ভান করার দরকার নেই,' হাসিমুখেই বলল সামনের পিস্তলধারী। 'তুমি খুব ভাল করেই জানো আমাদের পরিচয়। ভেবেছিলে ওই দু'জনকে ফাঁকি দিতে পারলেই বেঁচে যাবে, কেমন? বের করো ওটা!'

নিরীহ মুখভঙ্গি করল ও। 'কি বলছ এসব! কিছুই তো বুঝতে পারছি না। দেখো, আমাকে আর কেউ ভেবে ভুল করছ তোমরা। যদি টাকা-পয়সার ব্যাপার...'

'অভিনয় তো ভালই জানো!' খাঁটি বিস্ময় ফুটল লোকটার চেহারায়। 'ওই লাইনে থাকলেই ভাল করতে তুমি, মাসুদ রানা। দাও, বের করো পিস্তল।'

লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে ছিল ও, তাই তার মনের ইচ্ছে বুঝতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না। ও যেমন সময় নষ্ট করতে চাইছে, লোকটাও তাই চাইছে। কারণটাও স্পষ্ট, বিনা শব্দে কাজ সেরে কেটে পড়তে চায় ব্যাটারা। একান্ত প্রয়োজন না পড়লে গুলি ছুঁড়ে মানুষজন আকৃষ্ট করার ইচ্ছে নেই।

তাকিয়ে ছিল বলেই সময়টা চিনতে ভুল হলো না রানার। তার চক্‌চকে সোনার দাঁতে একটা ছায়া দেখা যাচ্ছিল, ওটাকে হঠাৎ দ্রুত নড়ে উঠতে দেখেই বসে পড়ল ও ঝপ্ করে, একই মুহূর্তে ওয়ালথার বের করে প্রথম গুলিটা পিস্তলধারীকেই করল। ওর এমন অস্বাভাবিক ফাস্ট রিফ্লেক্স দেখে হাঁ হয়ে গেল লোকটা, ওই অবস্থাতেই মরল কপালে গুলি খেয়ে। বিকট শব্দে কেঁপে উঠল কারপার্ক। পিস্তল খসে পড়ল তার হাত থেকে। সাথে হুড়মুড় করে পড়ল লাশটাও।

ওদিকে বসে পড়ার ঠিক আগ মুহূর্তে ওর বাঁ কাঁধ সই করে বিদ্যুৎ গতিতে ডান হাত চালিয়েছিল লম্বা চুলওয়ালা, টার্গেট হঠাৎ সরে যেতে মিস্ করল সে। ঝুঁকে এলো সামনে, হাতে ধরা দশ ইঞ্চি ফলার ড্যাগার কোথাও বাধা না পেয়ে ভীতিকর শব্দে বাতাস কেটে নিচের দিকে নেমে গেল। আর ঠিক তখনই কানের কাছে গুলির শব্দে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল যুবক।

ওটা তাকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয়নি বোঝামাত্র সামলে নিয়ে সিধে হতে গেল সে, কিন্তু তার আগে যে কয়েক মুহূর্ত দ্বিধায় পড়ে নষ্ট করেছে, তার খেসারত আদায় করে নিল রানা। বাঁ কনুই ওপর দিকে ছুঁড়ল ও গায়ের জোরে, সোজা লোকটার নাকমুখের ওপর পড়ল সেটা। গুঙিয়ে উঠে ধুপধাপ্ পা ফেলে পিছিয়ে গেল সে, সামলাতে না পেরে পড়েই গেল শেষ পর্যন্ত। কিন্তু হাত থেকে ড্যাগার ছাড়ল না।

নাক ভেঙে বসে গেছে, ওপরের পাটির দুটো দাঁতও খুইয়েছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে সারা মুখ, তবু ধড়মড় করে উঠে পড়ল সে, কিন্তু তাকে ঠেলে সামনে থেকে সরিয়ে দিল বাদামী চুল। তার হাতে ছয় ইঞ্চি ব্লেডের একটা ছোরা। ব্লেড নিচু করে ধরে ওস্তাদ ফাইটারের মত রানার দিকে এগোল সে। পিস্তলকে পরোয়া নেই।

লোকটার চোখে ভয়ের ছিটেফোঁটাও নেই দেখে অবাক হলো ও। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও এগিয়ে আসে নির্ভয়ে, এ কেমন জাতের মানুষ! গুলি খাওয়ার ভয় আপাতত নেই দেখে অন্য পথ ধরল ও। ঠিক করল অন্তত একটাকে ধরবে।

নিজের পিস্তল কোমরে গুঁজল ও, যুবকের ওপর চোখ রেখে কয়েক পা পিছিয়ে মৃত লোকটার অস্ত্র তুলে নিল।

ঠিক তখনই সগর্জনে পার্কে ঢুকল সেই হোন্ডা। র‍্যাম্প বেয়ে ঝড়ের গতিতে নিচে এসে স্কিড় করে ওদের গজ ত্রিশেক দূরে থেমে দাঁড়াল। পলকে বদলে গেল পরিস্থিতি। ঝট্ করে সেদিকে ঘুরে তাকাল দুই যুবক। লম্বা চুলওয়ালা এত দ্রুত মাথা ঘোরাল যে ঘামের মত ছিট্কে পড়ল কয়েক ফোঁটা রক্ত। হোন্ডার দিকে নজর দেয়ার সময় পেল না রানা, তার আগেই নিজেদের লোক দেখে নতুন করে উজ্জীবিত হয়ে চোখের পলকে চার্জ করল বাদামী চুল।

পিস্তল সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চোখের পলকে ওর বাঁ রিব কেজ সই করে ছোরা চালাল। ঝট্ করে ডানে সরে আঘাতটা এড়াল রানা, পরক্ষণে এক পা এগিয়ে কুড়িয়ে নেয়া পিস্তলের বাঁট দিয়ে ধাঁই করে মারল তার চোয়ালে। একই সাথে বাঁ হাতও চালাল রানা, সোলার প্লেক্সাসে এক হেভিওয়েট ঘুসি ঝেড়ে দিল। 'ঘ্যাক' করে উঠে পিছিয়ে গেল সে। তখনই দ্বিতীয় গুলির শব্দে কেঁপে উঠল পার্ক। হোন্ডার পিছনের আরোহী নেমে পড়েছে এর মধ্যে, সে-ই ছুঁড়েছে গুলি।

এক পলক দেখেই তার অস্ত্রটা চিনতে পারল রানা, ওটা লুগার। বসে পড়ল ও, পুরো ব্যাপারটা দুঃস্বপ্নের মত লাগছে। ওরই অফিসের কারপার্কে ওকে খুন করতে এসেছে একদল ড্যামকেয়ার ফ্যানাটিক, অথচ কেউ সাহায্য করতে আসছে না, অবিশ্বাস্য! পার্কের গার্ড দু'জনই বা কোথায়? গুলির শব্দ কানে যাচ্ছে না নাকি কারও!

বসেই গুলি করল রানা দ্বিতীয় আরোহীকে লক্ষ্য করে, সে-ও করল, তবে দুটো একই মুহূর্তে ছোঁড়া হয়েছে বলে একটাই আওয়াজ হলো। বুকে রানার গুলি খেয়ে আছড়ে পড়ল লোকটা, কিন্তু তার ছোঁড়া গুলি অল্পের জন্যে মিস করল রানাকে। একদম ওর কানের লতি ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল সেটা।

একই মুহূর্তে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল লম্বা চুলওয়ালা, তার ড্যাগার ঝিলিক মেরে উঠল শূন্যে। কিন্তু সেমসাইড হয়ে গেল শেষ সময়ে। সে লাফ দেয়ামাত্র পিছন থেকে হোন্ডা চালক গুলি করেছিল রানাকে সই করে, গুলিটা লাগল উড়ন্ত যুবকের ডান কানের একটু ওপরে। খুলি চুরমার হয়ে গেল তার, ছিটকে বেরিয়ে এলো হলুদ মগজ, কাছের পিলারে গিয়ে আছড়ে পড়ল 'থ্যাপ' করে।

আঘাত সামলে নিয়ে বাদামী চুলও এগিয়ে আসতে যাচ্ছিল, কিন্তু চোখের সামনে সঙ্গীর এই পরিণতি দেখে থমকে গেল। রাগে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে চেহারা। চিৎকার করে তাকে রানার সামনে থেকে সরে যেতে বলছে হোন্ডাচালক, কিন্তু কানেই তুলছে না সে। সুযোগটা কাজে লাগাল ও, গুলি করে লোকটার ছোরা ধরা হাতের কব্জি উড়িয়ে দিল। তারপর ঘাড়ের কাছে কলার চেপে ধরে হ্যাঁচকা টানে নিজের সামনে নিয়ে এলো, পিলারের সাথে বেদম জোরে মাথা ঠুকে দিল তার। টলে উঠল যুবক। আরেক বাড়ি মেরে তাকে ছেড়ে দিতেই পড়ে গেল সে।

চুরমার হয়ে যাওয়া ডান হাতের কব্জি চেপে ধরে আধা জবাই হওয়া খাসির মত দাপড়াচ্ছে। তাকে ছেড়ে দিয়েই এক লাফে কাছের পিলারের আড়ালে চলে

এলো রানা, একটু আগে যেটা লম্বা চুলওয়ালার রক্তে-মগজে মাখামাখি হয়ে গেছে। হোন্ডা-চালকের তরফ থেকে গুলি আশা করছিল রানা, কিন্তু এলো না। কানের কাছে মেঝেতে পড়ে গোঙাচ্ছে বাদামী চুল, এ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। একটু পর আরেক ধরনের আওয়াজ শুনল রানা, খুব চাপা একটা গুঞ্জন। কিসের শব্দ ওটা বোঝা গেল না। লিফটের? পলকের জন্যে উঁকি দিয়েই মাথা টেনে আনল ও, ভেবেছিল হোন্ডা চালককে দেখতে পাবে। কিন্তু নেই সে। হোন্ডা কাত হয়ে পড়ে আছে মেঝেতে। লোকটার খবর নেই।

কোথায় গেল ব্যাটা? উঁকি-ঝুঁকি মারতে শুরু করল ও। লোকটা যদি গাড়ির আড়ালে আড়ালে ওর পিছনে চলে যেতে পারে, তাহলে সমূহ বিপদ।

উপুড় হয়ে সারি সারি গাড়ির তলা দিয়ে তাকাল ও, কিছুই চোখে পড়ল না। উঠে বসল, আহত বাদামী চুলওয়ালাকে এক পলক দেখল। এতক্ষণ গোঙাচ্ছিল যুবক, এখন নীরব। হয়তো জ্ঞান হারিয়েছে। পেটের কাছে আহত হাতটা পড়ে আছে তার, ফ্লোর ভেসে যাচ্ছে রক্তে।

হঠাৎ পায়ের শব্দ উঠতে সতর্ক হলো রানা, উঁকি দিল। লিফটের আড়াল থেকে হোন্ডা চালককে একেবারে মার্চ করে বেরিয়ে আসতে দেখে ঝট্ করে পিস্তল তুলল, কিন্তু গুলি করার কথা ভুলে গেল তাকে 'হ্যান্ডস-আপ' অবস্থায় দেখে। লোকটার তিন হাত পিছনে আরও কেউ একজন আছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে না তাকে।

রানার পাঁচ গজ সামনে পৌঁছে কলারে টান খেয়ে ব্রেক কষল হোন্ডা চালক, তার বগলের তলা দিয়ে খোঁচা-খোঁচা দাড়িওয়ালা একটা নিষ্পাপ মুখ উঁকি দিল।

'এই রে! যা ভেবেচিলুম!'

'গিল্‌টি মিয়া!' তড়াক্ করে উঠে দাঁড়াল ও। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না যেন। 'তুমি...'

'কতা পরে হবে'খন, সার!' বলল সে। 'এটা আপনারই বক্‌রি তো? বলুন, কোতায় ছুরি চালাতে হবে, ন্যাজে, নাকি...'

লোকটা নড়ে ওঠায় থেমে গেল গিল্‌টি মিয়া, হাতে ধরা নিজের পিস্তল দিয়ে জোরে গুঁতো মারল তার মেরুদণ্ডে। চমকে উঠল লোকটা। 'ডেঁড়িয়ে থাক্ চুপ করে, আরাকবার নড়লে পোঁদে অ্যায়সা এক লাত্ মারব, বাপের নাম ভুলে যাবি, ব্যাটা। খচ্চর!'

অনেকদিন পর লোকটার 'ক্যালকাটার' বাংলা কানে যেন মধু ঢেলে দিল রানার। ওর দিকে ফিরে শিশুর মত সরল হাসি হাসল সে। 'লিপট্ থেকে বেরুতে গিয়ে দেকি কাচেই ব্যাটা এটা নিয়ে বসে আচে পেচন ফিরে।' বাঁ হাত তুলে একটা রুশ পিপিএস সাব-মেশিনগান দেখাল সে। 'সন্দো আগেই করেচিলুম, এটাকে দেকেই বুজলুম ঠিকই ভেবেচি। ব্যস্, আর কি! পেচন থেকে ছোঁ মেরে কেড়ে নিলুম ব্যাটার কামান, তারপর...'

'একটু আগে তুমিই নেমেছ লিফটে করে?'

'তাহালে আর বলচি কি, সার! সেই ককোন ওপর থেকে দেকলুম আপনার গাড়ি গ্যারাজে ঢুক্‌চে। ও মা! তারপর আর মানুষটার পাত্তাই নেই? লিপ্‌টের

দরজার কাচে ডেঁড়িয়ে আচি তো আচিই, খবর নেই আপনার। হটাৎ কেমন একটা শব্দ কানে এলো, আমি ভাবলুম...'

'আচ্ছা, আচ্ছা,' এর গল্প কোনদিন শেষ হবে না বুঝতে পেরে বাধা দিল রানা। 'ওপরে গিয়ে শুনব সেসব। আগে এর ব্যবস্থা করে নিই।'

এক ঘণ্টা পর।

সোহেল আহমেদের রুমে তার মুখোমুখি বসে আছে রানা। রানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে গিলটি মিয়া। হাত-কাটা সায়েবকে যমের মত ভয় করে গিলটি মিয়া, সামনে বসা তো দূরের কথা, দূর থেকে তাকে দেখলেই পালাই পালাই করে। কিন্তু আজকের পরিস্থিতি ভিন্ন। সবাই অন্যমনস্ক, চিন্তিত।

সোহেলকে দেখে বোঝা যায় ঘাবড়ে গেছে। দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগে ফরসা মুখটা কালো হয়ে আছে ওর। শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে আছে, নজর রানার ওপর স্থির। কিন্তু দেখছে না। সংস্থার প্রধান মেজর জেনারেল রাহাত খান এ মুহূর্তে লন্ডনে। গোয়েন্দা বিষয়ক আন্তর্জাতিক এক 'তথ্য বিনিময়' সম্পর্কিত রুটিন বৈঠকে অংশ নিতে গেছেন এক সপ্তাহের জন্যে। কাজেই অফিশিয়াল কর্মকাণ্ড মোটামুটি ওকেই সামলাতে হচ্ছে।

এমন সময় এরকম ঘটনায় ওর চিন্তা হওয়ারই কথা। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে হামলা হয়েছে বিসিআইয়ের সেফ হাউসের ওপর। তারপর রাত পোহাতেই আবার আক্রমণ, তা-ও একেবারে সংস্থার নাকের ডগায়। অবিশ্বাস্য! কাজটা কাদের, সে ব্যাপারে এখন কোন সন্দেহই নেই।

তার ওপর গিলটি মিয়া নতুন যে খবর শোনাল, তাতে মাথার মধ্যে সব এলোমেলো হয়ে গেছে সোহেলের। নতুন হামলার আশঙ্কায় বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছে ও। একদল সশস্ত্র গার্ড বসিয়ে দিয়েছে ভবনের কার পার্ক ও সবগুলো লিফটের সামনে। বিনা চেকিঙে কাউকেই ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না। বিসিআইয়ের নিজস্ব লিফট বন্ধ। অঘোষিত জরুরী অবস্থা চলছে সংস্থায়।

রানার দিকে ফিরল সোহেল। বলল, 'অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে ইতি একেবারে "শেষ সময়ে" ওদেরকে সন্দেহ করেছে। দেরি করে ফেলেছে অনেক।'

মাথা দোলাল রানা। 'হ্যাঁ। কিন্তু সেজন্যে ওকে দায়ী করারও উপায় নেই। ও যে খবরটা জানিয়েছে, তাই বেশি; আমরা তো নিশ্চিন্তে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছিলাম।'

'তা ঠিক।'

গিলটি মিয়ার দিকে ফিরল রানা। 'তুমি খায়রুল কবীরকে চিনলে কি করে? চেহারা তো বলছ একদম পাল্টে ফেলেছে সে!'

'তাতে কি, সার!' হাসল ছোটখাট মানুষটা। 'ওর বাপ চোদ্রী সায়েবও তো একবার নিজের খোল-নলচে পাল্টে ফেলেছিল, পেরেচে আমাকে ফাঁকি দিতে? আমার চোক হচ্ছেগে...' সোহেলের ভুরু কুঁচকে উঠতে শুরু করেছে দেখে ব্রেক কষল সে।

'কিন্তু কবীর চৌধুরীকে তুমি চিনতে পেরেছিলে ওর হাতের সিগারেট-কেস

দেখে,' রানা বলল।

'ওই হলো, সার! ইঁদুর চেনা যায় ন্যাজ দেকে, আর···যা দেকেই হোক, চিনতে তো পেরেচি!'

'পুরোটা খুলে বলো আবার,' সোহেল বলল গম্ভীর গলায়।

'সার,' নড়েচড়ে বসল গিলটি মিয়া। 'অনেক বচর হলো ক্যালকাটার সাতে কোন সম্পক্ক নেই। তাই ভাবলুম এবারের পুজোর···'

'সংক্ষেপে বলো,' রানা বলল।

চেহারা করুণ হয়ে উঠল গিলটি মিয়ার। সঞ্চিত মালমশলা সব দ্রুত খালাস না করে উপায় নেই বুঝতে পেরে একটু নয়, বেশ অনেকটাই হতাশ হলো। 'বেনাপোল হয়ে দেশে ফেরার সময় লোকটাকে দেখেছি, সার।'

'কি দেখে চিনলে তাকে?'

'কাল দুপুরে পেট্রাপোল কাস্টমসে পাসপোর্ট ফেরত পাওয়ার জন্যে বসে আচি, এই সময় বড় এক গাড়িতে চড়ে এলো খায়রুল কবীর। সঙ্গে কয়েকজন বিদেশী।'

'ভারতীয়?'

'জ্বি-না, সাদা চামড়ার।'

'তারপর?'

'প্রথমে সন্দো করিনি,' বলে চলল সে। 'সন্দো করার কিচু ছিলও না। এমনিতেই তাকিয়ে ছিলুম এতবড় গাড়িতে কে এলো দেকার জন্যে। গাড়ি থেকে নেমে দেকলুম নেংচে নেংচে গিয়ে গাড়ির বুট খুলে কি যেন করল লোকটা। তারপর ওটা বন্দো করে ফিরে এলো। তকনই সন্দো হলো।'

'কি দেখে?' সোহেল প্রশ্ন করল।

নিষ্পাপ, সরল মুখে হাসি ফুটল লোকটার। 'ব্যাটার ন্যাংচানো সেরে গেচে দেখে, সার।'

'মানে?'

'গেল ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে, অথচ ফিরে এলো একদম সিদে হয়ে। অবশ্য ভুলটা ধরতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিয়েছিল, কিন্তু কেউ দেকে ফেলল কি না এই ভয়ে চোরের মত বারবার এদিক-ওদিক তাকাতে দেকে বুজলুম কাবাবে হাড্ডি আচে। ভাল করে খেয়াল করতে দেকলুম ব্যাটার বাঁ কানের লতিতে একটা ফুটো, আর ডান চোকের পাশে একটা আঁচিল। নকল চুল দিয়ে ওটাকে ঢেকে রেকেছিল বটে, কিন্তু আমার চোক হচ্ছে, যাকে বলে···'

'নকল চুল?' রানা বলল।

'হ্যাঁ, সার। প্রায় কাঁদ পর্যন্ত লম্বা বাবরি চুল পরেচে ব্যাটা। তারওপর দাড়ি রেকেচে বুক-সমান। চেহারা লুকোতে কায়দা- কেত্তন কম করেনি ব্যাটা।'

'তারপর কি হলো?'

'গাড়ি নিয়ে বডার পার হয়ে যশোরে এসে পেলেনে উঠল। প্রাইবেট পেলেন, সার। ছোট।'

'কোন কোম্পানির জানতে পেরেছ?'

মাথা দোলাল সে। 'গায়ে বড় বড় হরফে লেকা ছিল; পায়রা এবিয়েশন।'

সামনের নোট প্যাডে নামটা লিখে নিল সোহেল। মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল। 'এই প্রথম শুনলাম নামটা।'

'আমিও,' বলল ও। চোখে প্রশ্ন নিয়ে গিলটি মিয়ার দিকে তাকাল।

প্রশ্নটা বুঝে ফেলল সে। দু'হাতের তালু চিত করে বলল, 'তারপর দলবল নিয়ে ফুড়ুৎ হয়ে গেল, সার।'

'কোনদিকে গেল খোঁজ নিয়েছিলে?'

'তা আবার নিইনি? এসব কাজ...' ব্রেক কষল রানাকে গম্ভীর হতে দেখে। 'ঢাকায় এসেছে, সার।'

সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারকমের দিকে হাত বাড়াল সোহেল। দ্রুত নির্দেশ দিতে শুরু করল, 'পায়রা এভিয়েশন নামে কোন এভিয়েশন কোম্পানি আছে কি না এখনই খোঁজ নিতে বলো "আই" সেকশনকে। ওদের কোন প্লেন গতকাল যশোরে গিয়েছিল কি না, তাও জানতে হবে। গিয়ে থাকলে সেখান থেকে ঢাকায় ফিরেছে না আর কোথাও গেছে, চার্টার পার্টির পরিচয়, সব তথ্য চাই। সেইসাথে কোম্পানির মালিকের নাম। গট ইট? তাড়াতাড়ি করতে বলো।'

রিসিভার রেখে দুধসাদা কাগজের টাইপ করা একটা শীট তুলে নিল। রানার উদ্দেশে বলল, 'এটা তোর কাল রাতে পাঠানো গুলির খোসার ব্যালিস্টিক পরীক্ষার রিপোর্ট।'

'কি আছে ওতে?' রানা বলল।

'কিছুই না,' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ চীফ। নাড়া লাগায় খড়মড় করে উঠল শীটটা। 'ওগুলো কি ধরনের গুলির, তা-ই ধরতে পারেনি এক্সপার্টরা। এক্কেবারে নতুন, আনকনভেনশনাল। ওই গুলি ছোঁড়ার মত অস্ত্র পৃথিবীর কোন্ দেশ আবিষ্কার করেছে, তারও কোনও রেকর্ড নেই। তাছাড়া ওগুলোর ক্ষমতা সম্পর্কে তুই যা বললি, এক্সপার্টরা শুনে একেবারে তাজ্জব হয়ে গেছে।'

'আশ্চর্য!' খানিক পর বলল রানা। 'তার মানে গিলটি মিয়ার খায়রুল কবীরকে দেখায় যদি কোন ভুল না হয়ে থাকে, তাহলে ধরে নেয়া যায় অস্ত্রটার আবিষ্কারককে পেয়ে গিয়েছি আমরা!'

মাথা দোলাল সোহেল। 'তাই তো মনে হচ্ছে।'

পালা করে ওদের দু'জনকে দেখছে গিলটি মিয়া। বুঝে উঠতে পারছে না আলোচনার বিষয়বস্তু।

'এক্সপার্টদের কয়েকজন সেফ হাউসে গেছে,' সোহেল বলল আবার। 'দেখা যাক, ফিরে এলে নতুন কোন তথ্য দিতে পারে কি না।' গিলটি মিয়ার দিকে ফিরল। 'লোকটাকে চিনতে কোন ভুল হয়নি তো তোমার?'

জোরে জোরে মাথা নড়ল সে। 'মোটেই না, সার! এমন ভুল হতেই পারে না আমার। এই খবর দিতেই তো এসেছিলাম, সার। এসে দেকি...'

'ও ঠিকই দেখেছে, সোহেল,' গম্ভীর গলায় বলে উঠল রানা। চেহারা থমথম করছে। অজানা শঙ্কায় গায়ের সমস্ত পশম দাঁড়িয়ে পড়েছে ওর। 'ভুল হয়নি।'

বিস্মিত হলো সোহেল। 'কি করে বুঝলি?'

চট্ করে উঠে পড়ল ও। ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠেছে। বারকয়েক রুমের এ-মাথা ও-মাথা পায়চারি করল রানা, তারপর হঠাৎ থেমে বন্ধুর দিকে তাকাল। 'ইতি প্রথমদিনই বলেছিল ওদের দলের একজন বিদেশে থাকে, মাঝেমধ্যে আসে বাংলাদেশে। লোকটা বিজ্ঞানী।'

চমকে উঠল সোহেল। 'ও হ্যাঁ, বলেছিলি তো!' বেকুবের মত চেহারা হলো ওর।

'তার মানে সন্দেহের আর কোন অবকাশই নেই,' রানা বলল।

'কেরামতুল্লাহ্ আর খায়রুল কবীর!' রুদ্ধশ্বাসে বলল সে। 'শেষ পর্যন্ত এক ফ্যানাটিক মোল্লার সাথে জোট বাঁধল লোকটা? আশ্চর্য তো!'

'আশ্চর্যের কিছু নেই,' মাথা নাড়ল রানা। 'স্বার্থ উদ্ধারই যেখানে আসল...' ইন্টারকমের শব্দে থেমে গেল।

রিসিভার কানে তুলল সোহেল। মৃদুকণ্ঠে বলল, 'কে?...হ্যাঁ, বলো। আচ্ছা...তারপর? হ্যাঁ...কোথায়? শুধুই রিফুয়েলিং করতে? আচ্ছা, আচ্ছা! বলে যাও।' মুখের সাথে হাতও চলছে ওর, সমস্ত তথ্য নোট প্যাডে লিখে নিচ্ছে রিসিভার কাঁধ দিয়ে কানের সাথে ঠেসে ধরে। একটু পর কলম রেখে দিল। 'গুড! এই সিরাজুল ইসলাম সম্পর্কেও সমস্ত তথ্য চাই আমার। বুঝতে পেরেছ?...হ্যাঁ, অপেক্ষা করছি।'

রিসিভার রেখে হেলান দিয়ে বসল ও। চিন্তিত চেহারায় তাকিয়ে থাকল রানার দিকে। 'পায়রা এভিয়েশন নতুন কোম্পানি, কয়েক মাস আগে চালু হয়েছে। ঢাকা-যশোর আর ঢাকা-কক্সবাজার রুটে চলাচল করে।

'ব্যস্?' ফিরে এসে বসল রানা।

'হ্যাঁ, দুটো প্লেন ওদের। একটা কাল যশোর গিয়েছিল। ওখান থেকে ঢাকা এসেছে শুধু রিফুয়েলিং করতে। প্যাসেঞ্জারদের কেউ নামেনি। কাজ সেরে কক্সবাজার চলে গেছে। তবে...'

'তবে কি?' ঝুঁকে বসল রানা।

'এখান থেকে কক্সবাজার যেতে যে সময় লাগে, তার ডবলেরও বেশি সময় পরে সেখানে ল্যান্ড করেছে ওটা। তখন কোন যাত্রী ছিল না।'

'তাহলে? মাঝের এই সময়টা...'

মাথা নাড়ল সোহেল। 'জানা যায়নি। আর এসব তথ্য জানতে হয়েছে ঢাকা-কক্সবাজার এয়ার ট্রাফিক সূত্র থেকে। পায়রা চেপে যাওয়ার চেষ্টা করেছে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'বোঝা গেছে।'

'কি?'

'হয়তো পার্বত্য চট্টগ্রামের ওদিকে কোথাও ওদের পাখির খাঁচা। ওদিকেই গিয়েছিল।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মাথা ঝাঁকাল সোহেল। 'ঠিক। হতে পারে। হতে পারে না, তাই হয়েছে।' বলেই বাঁ দিকের লাল টেলিফোনটার উদ্দেশে থাবা চালাল। বিশেষ একটা নাম্বারে ফোন করে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল, তারপর

নিজের সাঙ্কেতিক পরিচয় জানিয়ে তুফান গতিতে একের পর এক নির্দেশ দিতে শুরু করল। শেষে বলল, 'ওটার ল্যান্ডিং স্পট খুঁজে বের না করা পর্যন্ত ফেরা চলবে না। তাতে দু'দিন লাগুক, চারদিন লাগুক, সিম্পলি আই ডোন্ট কেয়ার।'

রিসিভার রেখে ফোঁস করে দম ছাড়ল ও। ইন্টারকমে কফির অর্ডার দিতে গিয়ে গিলটি মিয়ার দিকে তাকাল। 'কফি খাবে তো তুমি?'

কৃতার্থ হয়ে হাসল লোকটা। 'কফি? তা বলচেন যখন, দিন এক কাপ, খাই। কফি বানায়, সার, ওরা। ক্যালকাটার জাকারিয়া স্ট্রীটের...' সোহেল ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে আছে দেখে জবান আটকে গেল তার। অনেক কষ্টে হাসি চাপল রানা বেচারার অবস্থা দেখে।

একটু পর কফি নিয়ে এলো সোহেলের পি.এ, তার সাথে ছোট একটা কম্পিউটার প্রিন্ট আউট। সিরাজুল ইসলামের পরিচিতি। এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলল সোহেল, তারপর মাথা দোলাল। 'বা, বা! এ-ও দেখছি রীতিমত আরেক হাফেজ। নে, পড়ে দেখ্।'

কফিতে চুমুক দিয়ে শুরু করল রানাঃ নামঃ সিরাজুল ইসলাম, পিতা..., গ্রাম...। পেশাঃ খুচরা যন্ত্রাংশ ব্যবসায়ী। ঢাকার নবাবপুর ও চট্টগ্রামের জুবিলি রোডে বড় বড় ছয়টা দোকান আছে। চীনের কুনমিং থেকে মায়ানমার হয়ে আসা বড় স্কেলের চোরাচালানী দলের সঙ্গে জড়িত। সরকারের উঁচু মহলে যথেষ্ট প্রভাব আছে। আদর্শের দিক থেকে প্রো-পাকিস্তানী, ধর্মান্ধ, গোঁড়া, ধনী। বহুদিন থেকেই মাওলানা কেরামতুল্লার পার্টির সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে।...নিয়মিত মোটা অঙ্কের চাঁদা দিয়ে থাকে। সম্প্রতি এক প্রাইভেট এভিয়েশন কোম্পানি...।

কাগজটা রেখে দিল রানা। মাওলানা কেরামতুল্লাহ্‌র দুঃসাহসের কথা ভাবল। লোকটা কতখানি মরিয়া হয়ে উঠলে বিসিআইয়ের ঘাড়ের ওপর এসে ওকে খুন করার চেষ্টা করতে পারে, ভাবতে গিয়ে দুশ্চিন্তাতেই পড়ল ও। কি করতে চলেছে ওরা?

কুর্মিটোলা এয়ারফোর্স বেস থেকে একজোড়া সাধারণ, টু-সীটার প্লেন উঠল আকাশে। স্পটার প্লেন ওগুলো। সোজা কক্সবাজারের দিকে চলল শর্টকাট এয়ার রুট ধরে। সেখান থেকে রিফুয়েলিং সেরে আবার উড়ল। কি খুঁজতে হবে পাইলটদের জানা আছে, এয়ার ডিফেন্স অথরিটি জানিয়েছে, কিন্তু সেটার অবস্থান অজ্ঞাত।

কাজেই এলাকা ভাগ করে নিয়ে গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামের আকাশ জুড়ে ধীরগতিতে চক্কর দিতে শুরু করল ও দুটো। প্রথমদিন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছাড়াই কেটে গেল। পরদিন শেষ বিকেলে ঘটল ব্যাপারটা। বাংলাদেশ মায়ানমারের বর্ডারের খুব কাছ দিয়ে চক্কর মেরে ফিরে আসছিল ফ্লাইট সার্জেন্ট আনিস, ঘোরার সময় পিছনে তাকাতেই পড়ন্ত সূর্যের আলোয় কিছু একটা ঝিকিয়ে উঠতে দেখে সতর্ক হয়ে উঠল।

বঙ্গোপসাগরের ওপরে ভাসমান বড় এক খণ্ড মেঘের ভেতর থেকে আচমকা বেরিয়ে এসেছে ওটা—একটা খুদে প্লেন!

অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রাখল ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট। ওটার চালক যাতে কোন সন্দেহ করে না বসে, সেজন্যে কোর্স একচুল বদল না করে যেমন যাচ্ছিল, যেতেই থাকল। তবে নিজেদের বিশেষ ফ্রিকোয়েন্সিতে অন্য স্পটারকে খবরটা জানিয়ে দিল তৎক্ষণাৎ। পায়রার পাইলট কিছুই টের পেল না। দূর থেকে ওটার পিছু নিল দ্বিতীয় স্পটার।

এদিকে উত্তর দিগন্তে প্লেন দুটো মিলিয়ে যেতে বঙ্গোপসাগরের ওপর চলে এলো আনিস। উচ্চতা অনেকখানি কমিয়ে আন্দাজে ঘুরঘুর করতে লাগল চারদিকে। ভয়ের কিছু নেই বুঝতে পেরে সীমান্ত অতিক্রম করে মায়ানমারের আকাশে চলে এলো। তাড়া খাওয়ার ভয়ে রাডার এড়াতে আরও কমাল উচ্চতা।

মেঘটা ততক্ষণে বাড়তে বাড়তে ঢেকে ফেলেছে দক্ষিণ-পশ্চিম আকাশ, ফলে সময়ের আগেই সন্ধে নেমে গেছে। ফিরে যাওয়ার কথা ভাবছে ফ্লাইট সার্জেন্ট, তখনই ঝড় উঠল হঠাৎ করে। শেষ চক্কর দিয়ে বঙ্গোপসাগরের দিকে ঘুরেছে সে, এই সময়। নিচের গাছপালার আচ্ছাদন বাতাসের তোড়ে মহা লাফঝাঁপ শুরু করে দিল।

তখনই হঠাৎ গাঢ় সবুজের মধ্যে সাদা, বড়সড় একটা চত্বর চোখে পড়ল তার। একটা লেজও আছে তার। বিশ্বাস হতে চাইল না আনিসের, আবার ফিরে এলো জায়গাটার ওপর। অটো ক্যামেরা রেডি। জায়গামত পৌঁছে তাজ্জব হয়ে গেল সে। বুঝতে পারল ওটা একটা এয়ার স্ট্রিপ। অনবরত ক্লিক্! ক্লিক্! করতে শুরু করল তার অত্যাধুনিক ক্যামেরা।

শুধু স্ট্রিপের নয়, উল্টোদিকের কিছু গোলের ছাউনিওয়ালা কাঠের ঘরের ছবিও তুলল সে। তার সাথে কিছু মানুষেরও ছবি উঠল। আতঙ্কিত হয়ে ছোটাছুটি করছে তারা–ক্যামোফ্লেজড় ইউনিফর্ম পরা একদল মানুষ।

রাত ন'টায় ছবিগুলো পৌঁছে গেল ঢাকায়, সোহেলের ডেস্কে।

সাত

ফোন রেখে সামনের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকল মাওলানা মোহাম্মদ কেরামতুল্লাহ। অন্যমনস্ক, চিন্তিত। থেকে থেকে হাত বুলাচ্ছে দাড়িতে। প্রথমবার ইতিকে খতম করে দেয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হলেও ব্যাপারটাকে তেমন একটা গুরুত্ব দেয়নি সে। ভেবেছে, বদ মেয়েটার মা-বাপকে ধরে আনতে পারলেই সব সমসার সমাধান হয়ে যাবে। ধানাইপানাই ছেড়ে সুড়সুড় করে পথে চলে আসবে সে। সেটাও হলো না।

পরে যখন এসবের সঙ্গে মাসুদ রানার জড়িত থাকার খবর জানতে পেরেছে সে, তখন ঠিক করল ওরই একটা ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে গোটা ব্যাপারটার জড় কাটা পড়বে। এই মাসুদ রানা সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা ছিল তার। শুনেছে লোকটা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক। একবার যার পেছনে লাগে তাকে শেষ না করে ছাড়ে

না কিছুতেই।

কাজেই কাজটা যাতে দ্রুত সহি-সালামতে হয়, সে ব্যবস্থা করেছিল কেরামতুল্লাহ। আঁটঘাট ভালমত বেঁধেই নেমেছিল। কিন্তু আফসোস, এতগুলো হাত ফসকে ঠিকই বেরিয়ে গেল লোকটা। শুধু তাই নয়, উল্টো তার কয়েকজন ট্রেনিংপ্রাপ্ত, বিশ্বস্ত, একনিষ্ঠ খাদেমকে জান্নাতবাসী করে রেখে গেল। ওদের মধ্যে একজনের মৃত্যু শেলের মত বিঁধেছে তার বুকে। খুব কষ্ট পেয়েছে মাওলানা।

দলের নেতা ছিল সে। এক্স আর্মি। কম্যান্ডো বাহিনীর সদস্য। তার খাদেম বাহিনীর দেশী ট্রেনারদের একজন ছিল লোকটা। তার ওপর প্রচণ্ড আস্থা ছিল কেরামতুল্লাহর। সে যে এমন শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হবে, কল্পনাই করতে পারেনি। সদলবলে মরেছে সে। একজন ধরা পড়েছে বিসিআইয়ের হাতে।

সেটা অবশ্য কোনও সমস্যা নয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে পড়লে কি করতে হবে সে ব্যাপারেও খাদেমদের শপথ করিয়ে নেয়া হয়। বিনা দ্বিধায় আত্মহত্যা করেছে লোকটা। ওরা একটা কথাও বের করতে পারেনি তার মুখ থেকে। এতে একদিক দিয়ে তার অন্তত নিশ্চিন্ত হওয়ার কথা, কিন্তু তা তো হয়ইনি, বরং হয়েছে উল্টোটা।

মাসুদ রানা তার জন্যে এক মহা দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। লোকটা রীতিমত কাঁপ ধরিয়ে দিয়েছে তার বুকে। এতজন খাদেম যার একার সঙ্গে পেরে উঠল না, সে কেমন মানুষ, ভেবে পাচ্ছে না মাওলানা। বেঈমান ইতির মুখ থেকে তার ব্যাপারে এতক্ষণে অনেক কিছুই জেনে গেছে লোকটা। মুখে-মুখে কিছু প্রমাণ করতে পারবে না অবশ্য মেয়েটা, কিন্তু তবু সেই ভরসায় বসে থাকলে তো আর চলবে না।

এবার তাই সম্পূর্ণ অন্য ধরনের চাল চালবে সে।

পরদিন। বিসিআই অফিস।

মাওলানা কেরামতুল্লাহর কে-কে ভবনে হানা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে মাসুদ রানা। তার খাদেমদের নামের তালিকাটা দরকার। দেরি করার সময় নেই, কখন কি ঘটে বলা যায় না। সেদিনের সেই আজব অস্ত্র আর খায়রুল কবীরের বাংলাদেশে আসার খবরে ভেতরে ভেতরে অস্থির ও, তাড়াতাড়ি ব্যাপারটার ইতি ঘটাতে চায়। কাজেই আজ রাতেই যেতে হবে ওখানে।

টেলিফোনের শব্দে সচকিত হলো ও। অবাক হয়ে গেল লাল ফোনটা বাজছে দেখে। বিশেষ ফোন ওটা, খুব অল্প লোক জানে ওটার নম্বর। কপাল কুঁচকে রিসিভার তুলল। 'হ্যালো।'

'রানা ভাই? আমি ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের রেজাউল।'

'তুমি!' আরও অবাক হলো রানা। অন্য এক সরকারী গোয়েন্দা সংস্থার ফিল্ড অফিসার রেজাউল করিম, দেশের ভেতরে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ করে। একবার একসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে পরিচয় হয় দু'জনের। 'এই নম্বরে! ব্যাপার কি, রেজা?'

'ব্যাপার গুরুতর, রানা ভাই,' জবাব এলো। 'গত কিছুদিন ধরে আমরা কিছু

ডিস্টার্বিং নিউজ পাচ্ছিলাম আমাদের বিভিন্ন সোর্সের মাধ্যমে।'

'কি ধরনের নিউজ বলো তো?' প্রশ্ন করল রানা।

'একদল পাকিস্তানপন্থী ফ্যানাটিক ধর্মের নামে বড় ধরনের কিছু একটা ঘটাতে যাচ্ছে দেশে। খোঁজখবর নিয়ে আমার সন্দেহ হলো খবরটা মিথ্যে নয়। এদের হেডঅফিস বনানীতে।'

'আমি মনে হয় জানি তুমি কাদের কথা বলছ, রেজা।'

'জানেন!' এবার রেজাউল করিমের কণ্ঠে বিস্ময় ফুটল। 'কিভাবে? না, মানে...'

'সেসব এখন থাক, রেজা,' রানা বলল। 'আগে বলো তুমি ফোন করেছ কেন।'

'জ্বি, বলছি। ওদের দলের এক নেতাকে গত ক'দিন থেকে ফলো করছি আমি। এই মুহূর্তে গুলশানের এক বাড়িতে আছে সে।'

'কেরামতুল্লাহ?'

হাসল রেজাউল করিম। 'জ্বি।'

'তারপর?' প্রশ্ন করল রানা।

'এই মাত্র আরেক লোক এসে ঢুকল ওই বাড়িতে। আগে কখনও দেখিনি লোকটাকে, তবে আকার গঠন দেখে মনে হচ্ছে এই লোকই দু'দিন আগে বেনাপোল হয়ে দেশে ঢুকেছে। আমাদের বেনাপোল সোর্স...'

বাধা দিল রানা। 'দেখতে কেমন? সুদর্শন, লম্বা-চওড়া, ফর্সা?'

ওর গলার স্বর হঠাৎ বদলে যেতে ভড়কে গেল রেজাউল। 'কে! ও, হ্যাঁ! হ্যাঁ, আপনার বর্ণনা মিলে যাচ্ছে। আমরা...'

আবারও বাধা দিল ও। 'তুমি এখন ঠিক কোথায় আছ, রেজা? ফোন করছ কোত্থেকে?'

'গুলশান এক নম্বরে, রানা ভাই। মেইন রোডে না,সেকেন্ডারি রোডে। আগে যে বাড়িতে ব্রাজিলিয়ান দূতাবাস ছিল, সেটার কাছে। আমার মোবাইল সেট থেকে ফোন করছি।'

'শোনো, তুমি থাকো ওখানে, আমি এখনই আসছি,' খুব ব্যস্ত শোনাল রানার গলা।

'আপনি আসবেন? এদের ব্যাপারে আপনারাও...'

'এসব নিয়ে সামনাসামনি কথা বলব, রেজা। এখন ফোন রাখছি।'

'আচ্ছা। গাড়ি ভেতরে আনবেন না, মেইন রোডে রেখে আসবেন, রানা ভাই। আর আমাকে না চেনার ভান করবেন।'

'ঠিক আছে।' রিসিভার রেখে টেবিল থেকে মোবাইল ফোনটা তুলে নিল রানা, ঝড়ের বেগে ঢুকল সোহেলের রুমে। ওখানে মিনিট দুয়েক কাটিয়ে দ্রুত পায়ে লিফটের দিকে এগোল ও। তিন মিনিট পর মতিঝিলের যানজটের মাঝ দিয়ে যত দ্রুত সম্ভব গাড়ি ছোটাল উত্তর দিকে।

বিশ মিনিট পর গুলশান এক নম্বরের গোল চক্করে পৌঁছল ও, সুবিধে মত একটা জায়গায় গাড়ি পার্ক করে ব্রাজিলিয়ান দূতাবাসের পুরানো অফিসের দিকে

পা বাড়াল। অল্প পথ। কয়েকবার ডানে বাঁয়ে করে তিন মিনিটে পেরিয়ে এলো রানা। শেষ মোড় ঘুরতেই রেজাউলকে দেখতে পেল, পশ্চিমমুখো এক বাড়ির দেয়াল সংলগ্ন মুদি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে।

ওর সঙ্গে চোখাচোখি হতে ঘুরে দাঁড়াল রেজা, প্রায় জনহীন রাস্তা ধরে আগে আগে হাঁটতে লাগল। জোরে পা চালিয়ে তাকে প্রায় ধরে ফেলল রানা। 'কোন বাড়িতে?' আরেক দিকে তাকিয়ে বলল।

'সামনে, ডানদিকে। তাকাবেন না। লাল প্যারাপেটওয়ালা দোতলা বিল্ডিঙে।'

বিল্ডিংটা দেখল ও। সামনের বিশাল পোর্টিকোয় দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। একটা দেখেই বোঝা যায় নতুন, ঝকঝক করছে। মার্সিডিজ। বিল্ডিঙের সামনে লোকজন নেই। গাড়ি দুটোর ড্রাইভিং সীটেও কেউ নেই।

'বাড়িটা পেরিয়ে চলুন,' রেজাউল বলল। 'দুটো বাড়ির পরের বাড়িটার মেইন গেট খোলা আছে, ঢুকে পড়ুন ভেতরে। ডানদিকের সরু গলি দিয়ে পিছনদিকে চলে যান। ওখানে আমার লোক আছে। আমি কিছুদূর গিয়ে পিছনের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকব। দু'জনকে একসঙ্গে ঢুকতে দেখলে সন্দেহ করতে পারে ওরা।'

'কিন্তু…'

'বাড়ির ভেতর থেকে দূরবীন দিয়ে তাকালে লোক দুটোকে দেখতে পাবেন। দোতলার ড্রইং রুমে আছে ওরা।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু সময় হলো না। খোলা গেটের কাছে পৌঁছে গেছে, এখন মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা করলে সমস্যা হয়ে যাবে। ওবাড়ি থেকে কেউ যদি এদিকে নজর রেখে থাকে, সন্দেহ করে বসবে। কাজেই ঢুকে পড়ল রানা। দুই পাল্লার বড় গেট, পুরু স্টীল শীটের, ভেতর দিকে খোলা। গেট পেরিয়ে তিন পা এগোতেই কেন যেন গায়ের মধ্যে শিরশির করে উঠল। ঝট করে পিছন ফিরল ও, ডানহাত বিদ্যুৎ গতিতে উঠে যাচ্ছিল শোল্ডার হোলস্টারের দিকে। কিন্তু সামলে নিল শেষ মুহূর্তে।

একজোড়া বেড়াল। একটা অন্যটার গা চাটছিল ছায়ায় দাঁড়িয়ে। ওর অ্যাকশন দেখে ভড়কে গিয়ে ঝেড়ে দৌড় লাগাল কাছের এক ঝোপের দিকে। মুখে বেকুব হাসি নিয়ে এদিক ওদিক তাকাল রানা কেউ দেখে ফেলল কিনা বোঝার জন্যে। দেখেনি। সরু গলিটা ধরে বাড়ির পেছন দিকে চলে এলো ও, শেষ মাথায় একটা দরজা খোলা। কিচেন হবে সম্ভবত।

ঢুকবে কিনা ভেবে ইতস্তত করছে রানা, এমন সময় এক যুবক দেখা দিল দোরগোড়ায়। ছোটখাট, সুবোধ বালকের মত চেহারা, বয়স তেইশ-চব্বিশ হবে হয়তো। 'মেজর মাসুদ রানা?'

'হ্যাঁ,' বলল ও।

'আমি খায়ের। রেজা ভাইয়ের সহকারী। আসুন।'

ভেতরে ঢুকে পড়ল রানা। পর মুহূর্তে আকাশ ভেঙে পড়ল মাথায়। পিছন থেকে ভারী কিছু আছড়ে পড়ল ঘাড় ও খুলির সংযোগস্থলে। হুড়মুড় করে পড়ে গেল ও। জ্ঞান হারাবার আগে আবছা মত একটা ছায়া দেখতে পেল, দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে।

আধ ঘণ্টা পর জ্ঞান ফিরল রানার। চোখ খোলার আগেই মাথার যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠল ও। পাশ ফিরতে গিয়ে থেমে গেল। নড়তে পারছে না। এবার চোখ মেলল রানা। প্রথমে কিছুক্ষণ ঝাপসা দেখল, তারপর আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে এলো দৃষ্টি।

একটা কাঠের চেয়ারে বসে আছে ও। হাতলের সঙ্গে দু'হাত মজবুত করে বাঁধা। পা দুটোও বাঁধা পায়ার সঙ্গে। ওর মুখোমুখি আরেক চেয়ারে বসে আছে রেজাউল করিম। হাসছে মিটিমিটি। বয়সে ওর সমানই হবে যুবক, উচ্চতা পাঁচ ফুট আট। গাট্টাগোট্টা স্বাস্থ্য।

'এসবের অর্থ কি, রেজা?' কঠিন গলায় প্রশ্ন করল রানা।

'অনেকের কাছে শুনেছি মাসুদ রানাকে কেউ বোকা বানাতে পারে না,' হাসিমুখে বলল রেজা। 'কথাটা সত্যি কিনা একটু যাচাই করে দেখলাম, রানা ভাই। কিছু মনে করেননি তো? অন্যদের ধারণা মিথ্যে করতে পেরেছি বলে আমার কিন্তু খুব খুশি লাগছে।'

মুখ খুলতে গিয়েও থেমে গেল রানা। একটা মোবাইল টেলিফোন বাজছে। রেজাউলের ওটা। তার পাশের একটা টি-পয়ের ওপর রাখা। ওটা তুলল সে। কলার নম্বর দেখে নিয়ে কানে লাগাল। 'জ্বি।' একটু নীরবতা। 'হ্যাঁ, ভেঙেছে, এইমাত্র।...জ্বি? না, এখনও জিজ্ঞেস করার সুযোগ হয়নি।...জ্বি, এখনই করছি।...হ্যাঁ, আমি জানাব আপনাকে। জ্বি। জ্বি। আস্সালামোআলাইকুম।'

সেট রেখে রানার দিকে ফিরল যুবক। 'কাজের কথায় আসা যাক, রানা ভাই। ইতিকে কোথায় রেখেছেন?'

'কি বললে?'

'ইতিকে কোথায় রেখেছেন? আর সিডিটা? যেটা ওই মেয়ে চুরি করেছে গ্লোবাল ইন্টারন্যাশনাল থেকে?'

বিস্ময়ে চোয়াল ঝুলে পড়ল রানার। 'তুমি...! বুঝেছি। তুমি...'

'বুঝেছেন তাহলে?' ঠোঁট বেঁকে গেল রেজার। 'তা-ও ভাল। এবার বলুন কোথায়...মাথা নাড়ছেন যে?'

'আফসোস হচ্ছে, রেজা।'

'আফসোস? কেন?' ভ্রূ কুঁচকে উঠল যুবকের।

'তোমাকে নিজ হাতে খুন করতে আমার কষ্ট হবে তাই,' শীতল গলায় বলল রানা। 'ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করতাম তোমাকে। জানতাম তুমি একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক। সেই তুমি কিনা কেরামতুল্লার মত জঘন্য এক শয়তানের সঙ্গে হাত মেলালে শেষ পর্যন্ত? ছিহ্!'

'নীতিকথা রাখুন, সাহেব। যা জানতে চাইছি তার উত্তর দিন, হাতে সময় নেই। এখনও যে আপনি মরে জাননি, বেঁচে আছেন, সে কৃতিত্বটুকু আমার, সেটা জানেন? প্রথম গেটেই আপনাকে শেষ করে দেয়ার হুকুম ছিল মাওলানা সাহেবের। কিন্তু আমি তা হতে দিইনি, জানেন?'

'দিলেই বরং ভাল করতে, রেজা,' আগের চাইতেও শীতল গলায় বলল রানা। 'তোমার চরিত্রের এই নোংরা দিকটা দেখতে হতো না আমাকে।'

চেহারা দেখে বোঝা যায় মেজাজ একটু একটু করে চড়ছে লোকটার। অবশ্য প্রকাশ করল না। 'রানা ভাই, আপনার মুখ থেকে প্রশ্ন দুটোর উত্তর বের করার জন্যে আমাকে এক ঘণ্টা সময় দেয়া হয়েছিল।' ঘড়ি দেখল সে। 'সময় প্রায় শেষ। যদি জবাব না দেন, তাহলে...'

'ভুল ঠিকানায় কড়া নাড়ছ তুমি, রেজা। সারাজীবন সাধনা করলেও একটা কথাও বের করতে পারবে না।'

'এর পরিণতি কত ভয়ঙ্কর হবে জানেন?' রেগে উঠল যুবক।

'তোমার জন্যে নিশ্চয়ই চরম। সোহেল আহমেদকে বলে এসেছি, যদি এক ঘণ্টার মধ্যে আমি যোগাযোগ না করি, তাহলে ফোর্স নিয়ে...' থেমে গেল ও যুবককে হাসতে দেখে।

'আপনি খুব সুন্দর করে মিথ্যে বলতে পারেন, রানা ভাই। সোহেল সাহেবের সঙ্গে একটু আগেই কথা বলেছি আমি। জানিয়ে দিয়েছি দুই সন্দেহভাজনকে ফলো করে টঙ্গীর দিকে গেছেন আপনি। নিজে থেকে যোগাযোগ না করলে আপনাকে যাতে বিরক্ত করা না হয়, সে-কথাও জানিয়ে দিয়েছি। কাজেই সেরকম কিছু ঘটছে না। অযথা আজাব ডেকে আনবেন না, রানা ভাই। মাওলানা সাহেব খুব খেপে আছেন আপনার ওপর। তার অনেক বড় ক্ষতি করে ফেলেছেন আপনি। ওই মেয়েটা...'

আবার ফোন বেজে উঠতে বিরক্তি প্রকাশ করল রেজা। কানে লাগাল ফোন। 'জ্বি। না। এখনও...জ্বি? ও-ও...আচ্ছা! হ্যাঁ, এখনই যাচ্ছি।...ঠিক আছে।' ফোন রেখে মাথা নাড়ল। 'হলো না। এখনই যেতে হবে আমাদের।'

'কোথায়?' বলল রানা।

জবাব না দিয়ে উঠে পড়ল যুবক, পিছন ফিরে হাঁক ছাড়ল, 'খায়ের! নিয়ে এসো ওটা।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে এ রুমে চলে এলো তিনজন লোক। একজনকে আগেই সামনাসামনি দেখেছে রানা। আরও একজনকে মনে হলো দেখেছে। এই লোকটাই সম্ভবত পিছন থেকে মেরেছিল ওকে। গরিলার মত স্বাস্থ্য তার। বয়সে এবং দৈর্ঘ্যে রানার সমান, তবে পাশে দেড়গুণ। থ্যাবড়া নাক, ছোট ছোট কান। এককথায় মার্কামারা চেহারা।

অন্যজনের বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। মাঝারী উচ্চতার মানুষ। চোখে পুরু কাঁচের চশমা। এতই পুরু যে লোকটা চশমা ছাড়া দেখতে পায় বলে মনে হলো না রানার। লোকটার হাতে একটা সিরিঞ্জ।

'আসুন, ডাক্তার সাহেব,' বলল রেজা। 'পুশ করে দিন।' রানার দিকে ফিরে ক্ষমা প্রার্থনার হাসি হাসল। 'ঘাবড়াবেন না, রানা ভাই। এই ইঞ্জেকশনে মৃত্যু হবে না আপনার। বড়জোর ঘণ্টাখানেকের জন্যে অচল হয়ে থাকবেন শুধু। জেগেই থাকবেন, অথচ নড়ার ক্ষমতা থাকবে না। টঙ্গীতে আজ আবার হাটবার। খোলা গাড়িতে আপনাকে বেঁধেছেঁদে নিয়ে গেলে লোকের মনে সন্দেহ জাগতে পারে। কই, ডাক্তার, আসুন! খায়ের, গাড়ি রেডি?'

ওকে কোথায় নিয়ে যেতে চাইছে এরা, বুঝতে বাকি রইল না রানার। তাই

চুপ করে থাকল। মাথার মধ্যে কেবল বিশ্বাসঘাতক রেজাউলের চিন্তাই ঘুরছে। ও কেরামতুল্লাহর সঙ্গে জড়িত, বিশ্বাস করতে এখনও কষ্ট হচ্ছে রানার।

বসে আছে মাসুদ রানা। অবশ হাত দুটো কোলের ওপর পড়ে আছে। চোখ মেলে সামনে তাকিয়ে আছে ও, কিন্তু ঠিক মত দেখতে পাচ্ছে না কিছু। সব ঝাপসা। নড়তে চাইছে, কিন্তু পারছে না। অজ্ঞাত একটা শক্তি স্থবির করে রেখেছে ওকে। সামনে, পথের দু'পাশে, প্রচুর মানুষ-গাড়ি, সবই দেখতে ও বুঝতে পারছে। ব্যস, ওটুকুই।

মাঝারি গতিতে ছুটছে গাড়িটা। একটা মাইক্রোবাস। পিছনের প্রথম সীটে বসানো হয়েছে ওকে। ডানদিকে বসেছে ডাক্তার, তার পায়ের কাছে একটা ব্যাগ। বাঁ দিকের ফোল্ডিং সীটে বসে সেই ষণ্ডা—আবুল। খায়ের পিছনের সীটে, রেজা ড্রাইভারের পাশে। ড্রাইভার লোকটা বয়স্ক, কাঁচা-পাকা দাড়ি আছে।

বনানীর নৌবাহিনীর সদর দফতর ছাড়িয়ে এলো মাইক্রোবাস, রাস্তা একটু ফাঁকা পেয়ে গতি বাড়িয়ে দিল ড্রাইভার। সূর্য বেশ ঢলে পড়েছে, অস্ত যেতে আর বেশি দেরি নেই।

এয়ারপোর্টের কাছে ভিড়ের কারণে গতি একটু কমাতে হলো গাড়ির। তারপর আবার দৌড়। রেজাউল থেকে থেকে ঘুরে তাকাচ্ছে ওর দিকে, কিছুক্ষণ পর পরই ডাক্তারের দিকে ফিরছে। ওর অবস্থা কি জানতে চাইছে। জবাবে ফাটা রেকর্ডের মত একই জবাব আওড়াচ্ছে সে, 'কোন অসুবিধে নেই। ঠিক আছে।'

উত্তরা ছাড়িয়ে এসে পড়েছে গাড়ি, এমন সময়ে হঠাৎ করে রানার চোখের ঝাপসা ভাবটা কেটে যেতে শুরু করল। বাঁ হাতের কড়ে আঙুল কাঁপতে শুরু করেছে তিরতির করে। আশায় বুক নেচে উঠল ওর, দেহের অসাড় ভাবটা বেশ দ্রুত কেটে যাচ্ছে।

আবার ঘুরে তাকাল রেজাউল। 'অনেকক্ষণ তো হয়ে গেল,' ডাক্তারকে বলল। 'এখন আরেক ডোজ দিয়ে নিলে ভাল হতো না?'

রানার ডানহাতের তালুতে বিজ্ঞের মত দুটো টোকা দিল ডাক্তার, তারপর মাথা নাড়ল। 'এখনই প্রয়োজন নেই। সামনের বাজার ছাড়িয়ে গিয়ে দেয়া যাবে।' আস্থার সুর ফুটল তার কণ্ঠে।

টোকা দেয়ার পরও ওর আঙুলগুলো অসাড় দেখে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে লোকটা। যদি জানত রানা ইচ্ছে করেই ওগুলো শক্ত করে রেখেছে, তাহলে আর আস্থা ফুটত না তার কথায়।

টঙ্গী ব্রিজ পর্যন্ত যাওয়ার আগেই গতি মন্থর হয়ে এলো মাইক্রোবাসের। বেজায় ভিড়। হাটুরে মানুষ আর গাড়ি-ঘোড়ার চাপে যা-তা অবস্থা। মনে মনে আল্লাহকে ডাকতে শুরু করল রানা। আরেকটু দ্রুত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাড়া ফিরে আসার অপেক্ষায় মনে মনে তড়পাচ্ছে।

বাজার অতিক্রম করতেই প্রায় পাঁচ-সাত মিনিট লেগে গেল। ততক্ষণে রানা ভেতরে ভেতরে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। খোলা জায়গায় পড়তেই পিছনে ফিরল রেজাউল। 'এখনই আরেক ডোজ দিন, ডাক্তার সাহেব।'

তার চেহারায় পরিষ্কার উদ্বেগ দেখে করুণা জাগল রানার। ডাক্তার ঝুঁকে তার ব্যাগ খুলল, ওই অবস্থাতেই ঘাড়ে রানার এক ভয়ঙ্কর জুডো চপ খেয়ে তৎক্ষণাৎ মারা গেল। ঘাড়ের হাড় ভাঙার শব্দ পরিষ্কার শুনতে পেল সবাই।

ওয়ালথার জায়গামত নেই, আগেই বুঝে নিয়েছে রানা, তাই চপটা ঝেড়ে দিয়েই একযোগে অনেকগুলো কাজ করল ও বিদ্যুৎ গতিতে। ঝট করে পাশ ফিরে ডাক্তারের গায়ে হেলান দিল ও, তাকে পিছনের দেয়ালের সঙ্গে ঠেসে ধরে ডান পায়ে গায়ের জোরে এক লাথি বসিয়ে দিল আবুলের থুতনিতে। বিস্মিত হয়ে ঘুরে তাকিয়েছিল লোকটা, এমন সময় লাথি খেলো। এত জোরে আওয়াজ হলো, রানার মনে হলো ব্যাটার অন্তত একটা পাটি দাঁত মগজে সেঁধিয়ে গেছে।

কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাল না রানা, লাথির সাথে সাথে দুই হাতও চালাল। বাঁ হাতে পিছনে বসা খায়েরের কলার ও ডান হাতে চুলের মুঠি ধরে এক হ্যাঁচকা টানে লোকটাকে সামনে উড়িয়ে নিয়ে এলো, ক্যাব ও পিছনের অংশের লোহার পাইপের পার্টিশনের সাথে দড়াম করে ঠুকে দিল মাথা। চেঁচিয়ে উঠেই নেতিয়ে পড়ল খায়ের। লোকটাকে ধরে থাকা অবস্থাতেই আবার পা তুলল রানা, এক হাতে থুতনি চেপে ধরে কোমরে গোঁজা অস্ত্র বের করার জন্যে লড়াই করছিল আবুল, তার চোয়ালে আরেকটা দশাসই লাথি বসিয়ে দিল। ছিটকে গিয়ে জানালার ওপর পড়ল লোকটা। গাড়ি কেঁপে উঠল থরথর করে।

বিপদ টের পেয়ে সামনের সীটে রেজাউল আগেই ঘুরে বসেছে, নিজের অস্ত্রও বের করে ফেলেছে। কিন্তু রানা খায়েরকে ঢাল বানিয়ে রেখেছে বলে গুলি করতে পারছে না। আতঙ্কে চেঁচাচ্ছে সে চোখ কপালে তুলে, ড্রাইভারকে জোরে চালাতে বলছে। কিন্তু কাজ হচ্ছে না। পিছনের ধাঁই-ধুঁই শুনে ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে বয়স্ক মানুষটা। গাড়ি প্রায় দাঁড় করিয়ে ফেলেছে। পিছনে তাকাচ্ছে ঘন ঘন।

এদিকে বাজার ছাড়িয়ে এলেও মানুষজন, গাড়ির আসা-যাওয়ার কমতি নেই এখানটায়, কাজেই সাহসের অভাব নেই রানার। অজ্ঞান খায়েরকে ফেলে বাঁ দিকের দ্বিতীয় দরজা লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল। দ্বিতীয় লাথির ঠেলা তখনও সামলিয়ে উঠতে পারেনি আবুল, ওই অবস্থায় কাঁধ দিয়ে তার বুকের ওপর পড়ল রানা। তার কোমরে গোঁজা অস্ত্রটা এক ঝটকায় বের করে নিল। একটা ম্যাকারভ ওটা।

অস্ত্র হাতছাড়া হয়ে গেছে দেখেও আমল দিল না রাগে উন্মাদ ষাঁড়টা, তেড়ে আসতে যাচ্ছিল, কপালে গুলি খেয়ে ছিটকে স্লাইডিং দরজার ওপর গিয়ে পড়ল। ওদিকে গুলির শব্দে রেজাউল ও ড্রাইভার দু'জনই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। আচমকা ব্রেক কষল ড্রাইভার, লাফ দিয়ে রাস্তায় পড়েই ছুট লাগাল তীরবেগে। বিপদ টের পেয়ে রেজাউলও নেমে পড়ল। পথের ওপর পড়ে থাকা আবুলের ভারী শরীরটা এড়িয়ে নামতে বেশ সময় লাগল রানার। ততক্ষণে রেজাউলও হাওয়া। মেইন রোড পার হয়ে উল্টোদিকের এক গলিতে ঢুকে পড়েছে।

তাড়া করতে গিয়েও করল না রানা। জানে দেরি হয়ে গেছে। রাস্তাটার মাথায় রিকশা, ভ্যান গাড়ি ও টেম্পোর বাজার বসেছে যেন, তার সাথে রয়েছে হাটুরে মানুষের ভিড়। ওর মধ্যে ব্যাটাদের খুঁজতে যাওয়ার অর্থ হবে জেনেশুনে সময় নষ্ট করা। তাছাড়া দেশের যেখানেই পালাক রেজাউল, দু'দিনও লাগবে না

তাকে খুঁজে বের করতে।

নিজের চারদিকে তাকাল ও। এর মধ্যে বেশ বড়সড় ভিড় জমে গেছে ওকে ঘিরে, কিন্তু ওর হাতের জিনিসটা দেখে কেউ সাহস করে কাছে আসছে না। অর্ধেক বেরিয়ে থাকা আবুলের লাশের পকেট হাতড়ে একটা মোবাইল ফোন পাওয়া গেল। আশ্বস্ত হয়ে সোহেলের নম্বরে ফোন করল রানা।

দুর্বলতা আর উত্তেজনায় কাঁপছে একটু একটু।

আট

পরদিন।

ডিজাইনটা দেখে খুশি হলো রানা। ইতির আঁকা কে-কে ভবনের ডিজাইন ওটা। একটা প্রকাণ্ড শীটে পাশাপাশি তিনটে ডিজাইন এঁকেছে ও, দুটো সামনের এবং পিছনের, অন্যটা দশতলার। গ্লোবাল ইন্টারন্যাশনালের অফিসের লে-আউট। সবকিছু স্পষ্ট দেখানো আছে ওটায়। কোনটা চেয়ারম্যানের অফিস, কোথায় ভল্ট, কোথায় সিঁড়ি বা লিফট, সব।

ওগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল রানা, তারপর মাথা ঝাঁকাল সন্তুষ্ট হয়ে। 'গুড! চমৎকার হয়েছে। কিছুক্ষণ ভাল করে দেখে নিলে মনে হয় চোখ বন্ধ করেও পৌঁছে যেতে পারব জায়গামত।'

মৃদু হাসল ইতি। 'ধন্যবাদ।'

আজিমপুরে বিসিআইয়ের আরেক সেফ হাউস এটা, চায়না বিল্ডিঙের উল্টোদিকে। আগেরদিন ভোররাতে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে ইতিকে, খুব গোপনে। তারপরও কড়া গার্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে বাড়িটায়, তাছাড়া সংস্থার দুই জুনিয়র মেয়ে অপারেটরকে রাখা হয়েছে ইতিকে সঙ্গ দেয়ার জন্যে। তারাও সশস্ত্র।

দ্বিতীয় ডিজাইনের এক জায়গায় টোকা দিল রানা। 'পিছনের ফায়ার এস্কেপের সিঁড়ি না এটা?'

'জ্বি,' মাথা দোলাল ইতি। 'ওটার গোড়ায় একজন করে গার্ড থাকে চব্বিশ ঘণ্টা।'

'অস্ত্রসহ?'

আবার মাথা দোলাল ও।

'প্রত্যেকটা ফ্লোরের সঙ্গেই কানেকশন আছে এই সিঁড়ির?'

'আছে। সিঁড়ির একটা করে দরজা আছে প্রতি ফ্লোরে। ভেতর থেকে লক্ করা থাকে সব সময়।'

'কি ধরনের লক্?' গাল চুলকাল ও।

'অন্য ফ্লোরের কথা জানি না। দশতলায় ইয়েল লক্। দুটো। ওগুলো খোলা সহজ হবে না, রানা ভাই।'

'সে দেখা যাবে সময়মত। তালা ছাড়া আর কোন ব্যবস্থা নেই?'

'সিকিউরিটি চেইন আছে।'

'কোন অ্যালার্ম সিস্টেম?'

'না, পিছনের গেটে নেই,' বলল মেয়েটা। 'সামনের গেটে আছে অ্যালার্ম সিস্টেম।'

'তুমি শিওর?' দুজনের মাঝের টেবিলে কনুইয়ের ভর দিয়ে বসল রানা।

'হ্যাঁ। আপনি কি ভেতরে ঢুকবেন ঠিক করেছেন?'

মাথা দোলাল রানা। 'এবার ভল্ট সম্পর্কে বলো।'

'ওর মধ্যে ঢোকা সহজ হবে না, রানা ভাই। তার দরকারও নেই।'

'কি রকম?' চোখ কুঁচকে উঠল ওর।

'কেরামতুল্লাহ্‌র রূমেই কাজ সারতে পারবেন আপনি। তার পিসির সাথে মাস্টার কম্পিউটারের সংযোগ আছে। ভল্টে না গিয়েও যাতে সারাক্ষণ যোগাযোগ রাখা যায়, সেজন্যে এই ব্যবস্থা করিয়ে নিয়েছে সে।'

'বেশ!'

'কিন্তু...'

'আমি জানি তুমি কি বলবে,' রানা বলল। 'কিন্তু না গেলে চলবে না। যেতেই হবে আমাকে। কেরামতুল্লাহ্‌র পিসির পেটে কি কি তথ্য আছে, আমার জানতে হবে সব।'

'বুঝলাম,' মাথা দোলাল ইতি। 'কিন্তু বিপদের কথাও তো ভাবতে হবে আপনাকে। আমি জানি আপনি একা ওখানে গেলে ঠিক ধরা পড়ে যাবেন।'

হাসল ও। 'তুমি ভাবছ আমি সেসব চিন্তা করিনি? অবশ্যই করেছি। সবদিক বিচার বিবেচনা করে তবেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ঝুঁকি আছে, সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই বলে পিছ পা হলে চলবে না। কেরামতুল্লাহ্‌ যে কে-কের কথা বলত, তার নাম খায়রুল কবীর। লোকটা এক কথায় ভয়ঙ্কর, বাংলাদেশের ক্ষতি করবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছে সে।'

বড় বড় চোখ মেলে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে ইতি। চেহারায় রাজ্যের বিস্ময়। 'কেন?'

'সে অনেক কথা। আজ নয়, অন্য একদিন শুনো। তোমার প্রাক্তন বস্‌ যখন এই লোকের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, তখন বুঝতে হবে দেশের বড় ধরনের কোন সর্বনাশ ঘটাতে চলেছে তারা। এখন বসে থাকার সময় একেবারেই নেই। কাল ওরা কি ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করেছে আমাদের ওপর, ওগুলো কি করে কেরামতুল্লাহ্‌র হাতে পড়ল, এ সব প্রশ্নের উত্তর না জানা পর্যন্ত শান্তি হবে না আমার। দেরি হলে হয়তো সমস্ত তথ্য প্রমাণ নষ্ট করে ফেলবে ওরা।'

'আমার ভয়টাও সেখানেই, রানা ভাই,' মৃদু গলায় বলল ইতি। 'ওরা এখন ডেসপারেট, এ সময় যদি আপনি ধরা পড়েন, ওরা তাহলে ঠিক...'.

'প্রাণে মেরে ফেলবে আমাকে, তাই তো?' শব্দ করে হাসল মাসুদ রানা। 'কিন্তু সেই ভয়ে বসে থাকলে দিন চলবে না, ইতি। যেদিন এই পেশায় যোগ দিয়েছি, সেদিনই মৃত্যুকে এক পাশে সরিয়ে রেখেছি আমি। সেটা যখন হওয়ার

হবে। আমার একার প্রাণের চেয়ে দেশ বড়। অনেক বড়। দেশের কথা সবচেয়ে আগে ভাবতে হয় আমাদেরকে।

'তবে তুমি ভেবো না আমাকে মেরে কেরামতুল্লাহ্ পার পেয়ে যাবে। সেসব পাকা করেই কে-কে ভবনে ঢুকব আমি।'

'কি ব্যবস্থা?' প্রশ্নটা করল মেয়েটা।

'ওসব জেনে তোমার লাভ নেই। তুমি...'

'তবু বলুন,' বাধা দিল ও। 'আমি শুনতে চাই।'

'শুনতেই হবে?'

'হ্যাঁ, প্লীজ!'

'তাহলে শোনো। আমি যখনই কে-কে ভবনে ঢুকব, নির্দিষ্ট একটা সময় দিয়ে ঢুকব। তার মধ্যে যদি ফিরে না আসি, তখন আমার অফিস যা করার করবে।'

'সেটাই জানতে চেয়েছি আমি, রানা ভাই। কি করবে তখন আপনার অফিস?'

'নাহ্, তুমি বড় নাছোড়বান্দা!' বলল ও। 'আমি সময়মত ফিরে না এলে, অথবা অফিসের সাথে যোগাযোগ না করলে একদল লোক যাবে কে-কে ভবনের ঠিকানায়। কেরামতুল্লাহ্র ঘাড় চেপে ধরবে, হাত-পা একটা একটা করে টেনে ছিঁড়বে। মরার আগে লোকটা যাতে পানির বদলে নিজের রক্ত খেয়ে মরে, সে ব্যবস্থা করবে তারা।

'শক্তি খাটিয়ে হলেও দশতলায় যাবে ওরা, তোমার দেয়া কপি মেইন কম্পিউটারে হোক বা কেরামতুল্লাহ্র পিসি হোক, যে কোন একটায় ভরে পুরো ফাইলের ছবি তুলে আনবে। তাতে যে ওদেরকে বাধা দিতে যাবে, সে হয় গুলি খেয়ে মরবে, নয়তো অ্যারেস্ট হবে।'

'কিন্তু কে কে ভবনে প্রচুর সশস্ত্র গার্ড...'

হাসি বেঁকে গেল রানার। 'কতজন, দশজন? বিশজন? কিন্তু আমার লোকদের ব্যাক-আপ্ করবে শহরের গোটা পুলিস ফোর্স, বিডিআর, প্রয়োজন হলে আর্মি।'

'কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়া পুলিস...'

আবারও বাধা দিল ও। 'তুমি ফাইলটা কপি করে আনার পর থেকে যা কিছু ঘটল, তারচেয়ে বেশি কিছুর অন্তত এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন নেই। পুলিসি অ্যাকশনের জন্যে তা যথেষ্ট। কাজেই এ নিয়ে তোমার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।'

একটু ভাবল ইতি। 'আপনি যত সহজে বললেন, আমি তত সহজে মেনে নিতে পারছি না ব্যাপারটা। কারণ আমি ওদের চিনি। ওরা যে কত ভয়ঙ্কর...'

'আমরাও কম ভয়ঙ্কর নই,' হেসে ওকে অভয় দেয়ার চেষ্টা করল রানা। 'শুধু শুধু দুশ্চিন্তা করছ তুমি।'

'আল্লাহ করুন যেন তাই হয়।'

পায়ের কাছে ঠক্ করে একটা আওয়াজ উঠল, তারপরই মেঝেতে ধাতব মুদ্রা গড়ানোর শব্দে তাকাল রানা। ইতির পার্স মেঝেতে পড়ে আছে দেখতে পেল।

পড়ে খুলে গেছে।
ঝুঁকল রানা। 'আমি তুলে দিচ্ছি।' কয়েকটা ধাতব মুদ্রা, ছোট একটা চাবির রিং তুলে পার্সে ভরে শেষ আইটেমটার দিকে হাত বাড়াল। সোনালী রঙে কিনারা বাঁধানো ধাতব একটা বই, তিন বাই দুই ইঞ্চি। ওর হাত জিনিসটার কাছে পৌঁছার আগেই ইতি তুলে নেয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু তাড়াহুড়োয় টেবিলের সাথে কাঁধের ধাক্কা লাগায় হাত থেকে ছুটে গেল ওটা, ফ্লোরে ড্রপ্ খেয়ে একেবারে রানার পায়ের কাছে এসে পড়ল, মাঝখান থেকে মেলে ধরা বইয়ের মত।

একটা ফটো ফ্রেম। ভেতরের দুটো ছবির ওপর চোখ আটকে গেল রানার। তুলে নিল ওটা। ভুরু কুঁচকে উঠেছে আপনাআপনি। ইতির ব্যগ্রতা বা লজ্জায় আরক্ত হওয়া, কোনটাই খেয়াল করেনি। একজোড়া যুবক-যুবতীর ছবি রয়েছে ফ্রেমে–মেয়েটা ইতি, সঙ্গে এক যুবক। তাকে চিনতে পারল না রানা, যদিও চেহারা চেনা চেনা লাগল।

একটা ছবি কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে, অন্যটা ওখানকারই কোন মোটেলের বারান্দায় তোলা। একটায় যুবকের কাঁধে মাথা রেখে পোজ দিয়েছে ও, অন্যটায় পিছন থেকে তার গলা জড়িয়ে ধরে। হঠাৎ করে ছেলেটাকে চিনল রানা, সঙ্গে সঙ্গে জোর এক ঝাঁকি খেল।

'এ সেই ছেলে না, কাজল?'

নতমুখে নীরবে বসে থাকল ইতি।

ফ্রেমটা ভাঁজ করে ওর হাতে তুলে দিল রানা। চিন্তিত মনে বলল, 'এর সম্পর্কে প্রায় কিছুই বলোনি তুমি। কিন্তু ছবি দেখে মনে হচ্ছে বলার কিছু ছিল।'

সাড়া নেই।

'ছিল না?' মৃদু গলায় বলল ও।

ধীরে ধীরে মাথা দোলাল ইতি।

'ভালবাসতে পরস্পরকে?'

আবার মাথা দোলাল ইতি, অ্যালবাম খুলছে-বন্ধ করছে। হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'আমরা বিয়ে করেছিলাম।'

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল রানা। এমন কিছু শুনতে হবে ভাবেনি। 'আমি দুঃখিত। না জেনে কষ্ট দিলাম তোমাকে।'

কিছু বলতে চেষ্টা করল মেয়েটা, কিন্তু আবেগ আর গলা বিশ্বাসঘাতকতা করল, হঠাৎ কেঁদে ফেলল ঝরঝর করে। দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে, শেষ বিকেলের স্তিমিত আলোয় চিক্চিক্ করছে ওর দু'গাল।

কান্না থামতে অনেকক্ষণ লাগল, উঠে গিয়ে মুখ ধুয়ে এলো ইতি। নাকের ডগা টকটকে লাল হয়ে আছে, ফুলে উঠেছে চোখমুখ। নতমুখে বসে ডান হাতের তর্জনীকে কলম বানিয়ে বাঁ হাতের তালুতে আনমনে কি সব লিখছে।

'ওর সাথে তোমার পরিচয় কিভাবে?' বলল রানা।

'সে কথা তো সেদিনই বলেছি, রানা ভাই। ভাল রেজাল্ট করেও ভার্সিটিতে ভর্তি হতে পারছিলাম না, তখন কাজলই দেন-দরবার করে ভর্তি করিয়ে দেয় আমাকে। ও তখন বিজনেস ম্যানেজমেন্টে মাস্টার্স করছিল। ইসলামী মাইন্ডেড

ছিল ও।'

মাথা দোলাল রানা। 'সেটা দোষের কিছু না।'

'এই চাকরিটাও ওরই জোগাড় করে দেয়া।'

'আচ্ছা!' বলল ও।

'আমাদের সংসারের আর্থিক অবস্থা তখন খুব খারাপ ছিল,' বলে চলল ইতি। 'অন্যদিকে পরপর দু'বার স্ট্রোক করায় বাবারও যখন-তখন অবস্থা। ওর মধ্যেই আমাকে বিয়ে দেয়ার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছেন দেখে একদিন মাকে কাজলের কথা বললাম আমি। ওর আর আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অবশ্য একটা ইতিহাস আছে।'

'বলো,' রানা বলল। 'আমি শুনব।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মেয়েটা। মনে মনে কথা গুছিয়ে নিয়ে শুরু করল, 'কাজল আমাদের পাড়ারই ছেলে। অনেক দিন থেকেই পিছু নিয়েছিল আমার, তবে কখনও কিছু বলেনি। ভার্সিটিতে ভর্তির জন্যে ছোটাছুটি করে আমি যখন হতাশ, বুঝে ফেলেছি হবে না, তখন একদিন কাজল ওর এক বন্ধুকে দিয়ে প্রস্তাব পাঠাল, ও আমাকে ভর্তি করিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করিয়ে দিতে পারে।

'সন্দেহ হলো। গোপনে খোঁজ নিয়ে জানলাম, ও ভার্সিটির ধর্ম-ঘেঁষা এক সংগঠনের নেতাগোছের ছাত্র। ভাল লাগল না। ভাবলাম, একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার বোন হয়ে ওই ধরনের কারও সাহায্য নেয়া ঠিক হবে না। পরে ভেবে দেখলাম, হবে না কেন? যে জাতির স্বাধীনতার জন্যে আমার একমাত্র ভাই প্রাণ দিল, তাকে সে জাতি কি দিয়েছে? কিছুই না। এমনকি তার বোনকে ভার্সিটিতে ভর্তির ব্যাপারে সামান্যতম সহযোগিতা করতেও রাজি নয় তারা। তো আমি কেন মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধের তাবিজ গলায় পরে থাকি? ওই তাবিজ কি কাজে আসবে আমার! তাই রাজি হয়ে গেলাম।'

'বিনিময়ে কি দাবি করল কাজল?' প্রশ্ন করল রানা। 'তার সংগঠনের প্রতি অনুগত্য বা…'

'কিছু না।'

'কিছু না?' বিস্মিত হলো রানা।

'জ্বি, কিচ্ছু না।'

'আচ্ছা!' একটু চুপ করে থাকল রানা। 'ওর মৃত্যুর কারণ শুনেছি অন্তর্কলহ, সত্যি নাকি?'

'পত্রিকায় তাই লিখেছে। কিন্তু কথাটা সত্যি নয়। কাজল ছিল কেরামতুল্লাহ্‌র ডান হাত। আমি ওকে অনুরোধ করেছিলাম ওকাজ থেকে সরে আসতে।'

কারণটা বুঝতে অসুবিধে হলো না, তাই এ নিয়ে কোন প্রশ্ন করল না রানা। মুখ নামিয়ে টেবিলের কোণ খুঁটতে লাগল ইতি। 'আসলে আমিই ওকে মেরে ফেলেছি, রানা ভাই। ভর্তি হতে পেরে ওর প্রতি ভীষণ কৃতজ্ঞ হয়ে পড়েছিলাম, তা যে কখন ভালবাসা হয়ে দাঁড়িয়েছে, বুঝতেই পারিনি। যখন পেলাম, তখন ফিরে আসার পথ ছিল না।

'ভাবলাম, একজন মুক্তিযোদ্ধার বোন হয়ে কাজলের মত একজনের ঘর করব

জীবনভর?'

'তুমি কি কখনও ভেবে দেখেছ, মুক্তিযুদ্ধ আর ধর্মবিশ্বাসে কোনও বিরোধ নেই?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ, ও-ও ঠিক এই কথাই বলেছিল। বলেছিল: দালালদের সঙ্গে ও নেই, আছে বিশ্বাসীদের সঙ্গে; দেশের মঙ্গলের জন্যে কিছু করতে চায়। কেরামতুল্লার সঙ্গে ও যোগ দিয়েছিল তাকে সংকীর্ণতামুক্ত মস্ত এক নেতা মনে করে। কিন্তু ধীরে ধীরে তার আসল পরিচয় যখন বেরিয়ে এলো তখন ছুটে এসে আমাকে জানাল, দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবে না ও, সরে যাবে ও কেরামতুল্লার দল ছেড়ে। বিদেশে চলে যাবে। ধীরে ধীরে কেরামতুল্লাহ্‌র খপ্‌পর থেকে বেরিয়ে আসবে বলে প্রস্তুতি নিচ্ছিল,' মাথা নাড়ল ও। 'হলো না।'

'কাজলই তাহলে তোমার মূল সোর্স?'

'হ্যাঁ। এরমধ্যে কোনদিক দিয়ে যে দু'বছর কেটে গেল, টের পাইনি। মাস্টার্স পাস করলাম। আমাদের সংসারের দুরবস্থা দেখে কেরামতুল্লাহ্‌র ওখানে চাকরির ব্যবস্থা করে দিল কাজল। বলল, মুখ বুজে কাজ করে যেতে। ও নিজে তখন বিদেশে চলে যাওয়ার ব্যাপারে গোপনে কাজ করছে। বহু ঘোরাঘুরির পর আমেরিকার ভিসা পেয়েও গিয়েছিল, কিন্তু কেরামতুল্লাহ্ যেতে দিল না।'

উদাস চোখ মেলে নিউ মার্কেট মসজিদের মিনারের দিকে তাকিয়ে থাকল ইতি।

'তার মানে, কাজল ছেলেটা সত্যিই বদলে গিয়েছিল,' মন্তব্য করল রানা।

'আপনি বলতে চাইছেন, ফ্যানাটিসিজমের পথ ছেড়ে সরে এসেছিল, তাইতো? আসলে ও কখনও ফ্যানাটিক ছিল না। বাস টার্মিনালে দেখেননি, লং-ডিস্ট্যান্স যাত্রী দেখলে বাস কোম্পানির দালালরা কেমন ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ওপর? টানাহ্যাঁচড়া শুরু করে দেয় নিজেদের বাসে তোলার জন্যে? আজকাল তো স্কুল-কলেজ, সবখানেই এই রীতি চালু হয়েছে। নতুন কেউ গেলেই হুড়োহুড়ি পড়ে যায় তাকে দলে টানার। কাজল ছিল তাই। তেজগাঁ কলেজে ভর্তি হতে গিয়েই ওদের হাতে পড়েছিল।'

'তোমাদের বিয়ের খবর জানে না কেরামতুল্লাহ্?'

'নাহ্! জানলে কবে দূর করে দিত!'

'কাজলের খুনী কে?'

'কেরামতুল্লাহ্‌র প্রধান খাদেম, শমশের আলি। বিহারী।'

'কতদিন হলো ওর মৃত্যুর?'

'ছয় মাস।'

মাথা নাড়ল ও। 'এরপরও এতদিন কি করে চাকরি করলে ওখানে?'

'জানি না। কাজলের মুখেই শুনেছি লোকটা দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। আমি নিজেও তো কিছু কিছু নমুনা দেখেছি। তাই ওর মৃত্যুর পর প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, একদিন লোকটার বিরুদ্ধে তথ্য প্রমাণ জোগাড় করে ধ্বংস করে ছাড়ব তাকে। তাই হয়তো আল্লাহ্ আমার ধৈর্য শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।'

মনে মনে মেয়েটার মনোবলের প্রশংসা করল রানা। 'কিন্তু কাজলের কথা

তো তুমি আরও আগে জানাতে পারতে আমাকে।'

আবার সেই বিষণ্ণ হাসি ফুটল ওর মুখে। 'কি লাভ হত? বললে কি ওকে ফিরিয়ে দিতে পারতেন?'

জবাব একটু পরে দিল ও। 'মানুষের সে সাধ্য নেই, ইতি। থাকলে চেষ্টা করে দেখতাম ওকে ফিরিয়ে দিতে। তোমার যে ক্ষতি হয়ে গেছে, মুখে মুখে দুঃখ বা সান্ত্বনা প্রকাশ করলে তা পূরণ হবে না। তাই সে চেষ্টা করবও না। শুধু এটুকু কথা দিচ্ছি, যারা কাজলের মৃত্যুর জন্যে দায়ী, তাদের দিন শেষ। কেউ রেহাই পাবে না। ব্যাপারটা আমি নিজে দেখব।'

'আমিও সেই আশাতেই বুক বেঁধে রেখেছিলাম, রানা ভাই,' গলা কেঁপে গেল ইতির। ওড়নায় চোখ মুছল।

কেরামতুল্লাহর শেষ দেখে ছাড়বে ও আজ। অনেক বাড় বেড়েছে লোকটার।

নয়

প্রয়োজনীয় সবকিছু নেয়া হয়েছে কিনা দেখে নিল মাসুদ রানা। সন্তুষ্ট হয়ে হাতঘড়িতে দেখল–বারোটা চল্লিশ। আরও একটু রাত হোক, ভাবল ও, আরেকটু নির্জন হোক, তারপর···

একটা সিগারেট ধরিয়ে রুমের আলো নেভাবার জন্যে এগোচ্ছিল, এই সময় দরজার কাছে গিল্‌টি মিয়ার মৃদু কাশির শব্দ শুনে ঘুরে তাকাল। রাঙার মার চাপাচাপিতে আজকের রাতটা এখানেই থেকে গেছে গিল্‌টি মিয়া।

'কি ব্যাপার, এখনও জেগে আছ?'

মাথা চুলকাল লোকটা। 'রাঙার মার ভ্যাজভ্যাজানির ঠেলায় ঘুমাতে আর পারলাম কোতায়, সার?'

'সে কি!' অবাক হলো রানা। মানুষটার চেহারা দেখে হাসি চেপে রাখা কঠিন হয়ে উঠল ওর পক্ষে।

'হ্যাঁ, সার! বাবা-সোনা বলে কাচে শুইয়ে রাজ্যের প্যানপ্যান শুরু করে দিয়েচে বুড়ি। কানের মাতা খেয়ে ফেলার জোগাড়।'

এবার হেসেই ফেলল ও। 'তাই নাকি? তা এত কিসের কথা?'

'ওই যে, একমাস ক্যালকাটায় থেকে এলুম, এর মদ্যে যত কতা জমেচে, স-ব। কোনটা রেকে কোনটা বলি? পাশের বাড়ির বেড়ালটা একজোড়া সাদা বাচ্চা দিয়েচে, সে কতা জানাতেও ছাড়েনি।'

'তা তুমি ঘুমের ভান করে পড়ে থাকলেই তো পারতে!' বলল রানা।

'চেয়েছিলুম, সার।' আবার মাথা চুলকাল সে। 'কিন্তু হাজার হোক, মায়ের বয়সী মানুষ···কোতাউ বেরুচ্ছেন, সার? ঘন ঘন ঘড়ি দেক্‌চেন যে?'

'হ্যাঁ, একটু কাজ আছে।'

কাজটা কি হতে পারে অনুমান করে নিল গিল্‌টি মিয়া, সঙ্গে সঙ্গে ঘুমাতে না

পারার দুঃখ ভুলে গেছে। 'আমিও আসি, সার?'

'কোথায়?'

'আপনি যেকানে যাবেন, চোদ্রীর ব্যাটার ন্যাজে পা দিতে?'

মন্দ হয় না, ভাবল রানা। গিলটি মিয়া সঙ্গে থাকলে বরং ওর সাহায্যই হবে। 'যাবে? চলো তাহলে।'

একটা বেজে গেছে দেখে উঠল ও, রুমের আলো নিভিয়ে দিয়ে সামনের জানালার দিকে এগোল। এদিকটায় মেইন রোড। পর্দা সামান্য সরিয়ে উঁকি দিল, ডানে-বাঁয়ে দেখে নিল অনেকক্ষণ ধরে। নাহ্, কোথাও কেউ নেই। দোকানপাট সব অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। মাঝেমধ্যে এক-আধটা রিকশা চোখে পড়ছে, বাংলা সিনেমার অশ্রাব্য গান চেঁচিয়ে গাইতে গাইতে প্যাডেল মারছে চালক: মন চাইলে মন, দেহ চাইলে দেহ!–সাঁই সাঁই করে ছুটে যাচ্ছে সামনে। এ ছাড়া রাস্তা প্রায় ফাঁকা।

তবু নড়ল না ও, নজর ঘুরে বেড়াচ্ছে। দূর থেকে পাহারাদারের বাঁশির শব্দ ভেসে আসছে। ঝাড়া দশ মিনিট পর নিশ্চিত হলো রানা, পর্দা ছেড়ে সরে আসতে যাচ্ছিল, তখনই ব্যাপারটা চোখে পড়ল।

রাস্তার ওপারে, এক লাইট পোস্টের গোড়ায় একটা সরু, হলদেটে আলো লাফিয়ে উঠল। বাতি জ্বলছে না ওই পোস্টে, ফলে নিচটা একদম অন্ধকার। চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকল রানা, হলুদ আলো থেকে আরেকটা টকটকে লাল আলোর উৎপত্তি হলো। এটা গোল।

সিগারেট ধরিয়েছে কেউ। ব্যাটা দাঁড়িয়ে আছে কিনা বোঝার জন্যে আরও পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করল রানা। ধীরে ধীরে কঠোর এক টুকরো হাসি ফুটল মুখে। গিলটি মিয়াও লক্ষ করেছে ব্যাপারটা।

'সার, ফেউ মনে হচ্চে!'

'তাই তো দেখছি।'

'ধরে আচ্ছা করে প্যাঁদানি দিলেই ভেউ ভেউ করে...'

'দাঁড়াও, আগে বুঝতে দাও ভাল করে,' বলল রানা। ভাবল, ব্যাটা কি ওর ওপরই নজর রাখতে এসেছে? শুধুই নজর রাখতে? নাকি রাত আরও গভীর হলে ওর ব্যবস্থা করতে ভেতরে আসার চেষ্টা করবে?

আরও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও কিছু বোঝা গেল না। এই অবস্থায় কাজে বের হতেও মন সায় দিল না ওর। লোকটা যদি আসেই, ওকে দেখতে না পেলে নিশ্চয়ই সতর্ক করে দেবে কেরামতুল্লাহ্‌কে। 'নাহ্, ব্যাটার ব্যবস্থা না করলে আর চলছে না।'

'গরীবের কতা বাসি হলে ফলে,' আপনমনে বিড়বিড় করে বলে উঠল গিলটি মিয়া। 'তকনই তো বলেছিলুম...'

'দাঁড়াও!' তাকে দরজার দিকে পা বাড়াতে দেখে ডেকে উঠল রানা। 'আমিও আসছি। পিছন দরজা দিয়ে...'

'এই সাম্মান্য কাজের জন্যে আপনাকে যেতে হলে আর আমি রয়েচি কি জন্যে?' বলল লোকটা। 'ওরকম দু'চারজনের জন্যে আমি একাই তো যতেষ্ট, সার!'

আর বাধা দিল না রানা, নিজের 'পেস্তলের' মাথায় সাইলেন্সার পরিয়ে বিড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে বেরিয়ে গেল মানুষটা। চোখের পলকে হাওয়া হয়ে গেল। মনে মনে হাসল ও, *বত্রিশ বচরের প্র্যাকটিস!* পরক্ষণে সামনে তাকিয়ে সশব্দে আঁতকে উঠল—একজন নয়, দু'জন আছে ওখানে। একজন এতক্ষণ কোথায় ছিল ভেবে পেল না রানা। হঠাৎ আকাশ থেকে পড়েছে যেন ব্যাটা।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে, এখন আর গিল্‌টি মিয়াকে ডেকে ফেরানোর সময় নেই। চলে গেছে সে। হন্তদন্ত হয়ে রানাও বেরিয়ে পড়ল, সতর্ক পায়ে দ্রুত এগোল। কিন্তু তার আসলে দরকার ছিল না, সময় থাকতে দ্বিতীয়জনকে গিল্‌টি মিয়াও ঠিকই দেখে ফেলেছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক কষল সে। বিড়বিড় করে বলল, 'এই মরেচে! ওটা আবার কখন জুটল?'

অন্ধকার বৈদ্যুতিক খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একজন। একেই সম্ভবত সিগারেট ধরাতে দেখেছিল ওরা। অন্যজন একটু পিছনে একটা টেলিফোন বক্সের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো। পিছনের পটভূমি কালো বলে এতক্ষণ দেখা যায়নি। সঙ্গীর সিগারেটের আগুন দিয়ে সে-ও একটা ধরিয়েছে বলে এখন দেখা যাচ্ছে।

বাঁ দিক থেকে ওদের পাঁচ হাতের মধ্যে পৌঁছে নিঃশব্দে দাঁত বের করে হাসল গিল্টি মিয়া। পিস্তল তুলে ধরে জোরে কেশে উঠল। ভীষণ ভাবে চমকে উঠল লোক দুটো, লাফিয়ে ঘুরে তাকাল। পরমুহূর্তে জমে গেল তার হাতে একটা অস্বাভাবিক দীর্ঘ নলের পিস্তল দেখে।

'এটা আসল মাল, বাওয়া,' বলল গিল্টি মিয়া। 'সন্দো থাকলে লাইটার জ্বেলে দেকে নাও। তারপর বার করো সঙ্গে যা যা আচে।'

নড়ল না কেউ। একদম জমে গেছে জায়গায়। 'কি চান আপনি?' একজন সাহস করে বলল। দীর্ঘদেহী সে, বয়সও কম। পয়লা চোটে ঘাবড়ে গেলেও 'ছিনতাইকারী' গিল্টি মিয়ার সাইজ দেখে হারানো মনোবল কিছুটা হলেও ফিরে পেয়েছে।

অন্যজনকে দেখল সে। এ লোক একটু বয়স্ক, ত্রিশের বেশিই হবে বয়স। বেশ খাটো সঙ্গীর তুলনায়। দুজনের পরনেই জিনস, বয়স্ক লোকটার গায়ে টি-শার্ট, যুবকের শার্ট। পায়ে কেডস।

'টাকা-পয়সা যা আছে, বার করো!' চাপা ধমক লাগাল গিল্টি মিয়া। 'জলদি!'

'টাকা-পয়সা!' দ্বিতীয়জন বলল।

মাথা নাড়ল গিল্টি মিয়া। 'উঁহু! তোমাদের রূপ-যৌবন, সতীত্ব। বার কর্! দেরি করেচিস্ কি পোঁদে অ্যায়সা লাত্ মারব, বাপ্-দাদার নাম ভুলে যাবি।'

একে তার সাইজ, তারওপর ভাষা, দুটোই দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে লোক দুটোকে। এরকম একজনের কাছে হার মানার কথা ভাবতেও প্রেস্টিজে বাধছে। বয়স্ক লোকটা এক পা এগোল। ডান হাত পকেটের দিকে যাচ্ছে একটু একটু করে। 'দেখুন, আমাদের কাছে তো টাকা-পয়সা...'

গিল্টি মিয়ার পিস্তল ধরা হাত বিদ্যুৎ গতিতে তার নাক বরাবর হতে দেখে

সশব্দে আঁতকে উঠে থেমে গেল লোকটা, হাঁ হয়ে গেল খুব সম্ভব চিৎকার করার জন্যে।

'চোপ্!' দাঁত খিঁচাল সে। 'হাত বার কর্ পকেট থেকে!'

ভয়ে ভয়ে তাই করল লোকটা।

'ঘুরে ডেঁড়িয়ে থাক্!' কড়া হুকুম করল এবার গিল্টি মিয়া। 'দু'জনেই। আচে কি নেই আমি দেকচি।'

অসহায়ের মত পরস্পরের দিকে তাকাল লোক দুটো, ওর কথামত কাজ করবে কি না বুঝে উঠতে পারছে না। তাদেরকে সাহায্য করল গিল্টি মিয়া, নল নিচু করে দু'জনের মাঝখানে ফুটপাথে একটা গুলি করল। 'দুপ্!' শব্দ কানে যেতে আরেকবার চমকে উঠল লোক দুটো, বুঝে ফেলল মানুষটার আকার ও ভাষা বিপজ্জনক না হলেও হাতের জিনিসটা ঠিক উল্টো।

দ্রুত ঘুরল তারা। সঙ্গে সঙ্গে নতুন নির্দেশ, 'দু'হাত মাতার ওপর! হাঁ, এবার হয়েচে। এইজন্যেই বলে বীচিতে গুঁতো না দিলে বলদ কতা শুনতে চায় না। শালা, ইবলিশের দল!'

কথার ফাঁকে এগিয়ে এলো গিল্টি মিয়া। বয়স্ক লোকটা সুযোগ পেলেই ঝামেলা বাধাবে, কাজেই প্রথমে তার ঘাড়ে পিস্তল ঠেসে ধরল। ঠাণ্ডা, কঠিন ধাতুর স্পর্শে শিউরে উঠল সে। পরক্ষণে প্যান্টের ডান পকেট থেকে তার পিস্তলটা তুলে নিল গিল্টি মিয়া, পরক্ষণে নিজেরটার বাঁট দিয়ে ধাঁই করে মেরে বসল তার কানের পাশে। টুঁ শব্দটিও করার সুযোগ পেল না লোকটা, হুড়মুড় করে পড়ে গেল। সঙ্গীর এই অবস্থা দেখে মনে মনে আধমরা হয়ে গেল অন্যজন। কাঁপুনি উঠে গেছে সর্বাঙ্গে। পিস্তল হাতছাড়া হতে তা আরও বেড়ে গেল।

'বাঁদো এটাকে!' বলল সে। প্যান্টের দুই পকেটে রাখল অস্ত্র দুটো। দুটোই ম্যাকারভ।

'অ্যাঁ!' বুঝতে না পেরে কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে তাকাল যুবক।

'এটাকে বাঁদো!'

'কি দিয়ে বাঁধব? দড়ি তো নেই।'

কোমরের বেল্ট দিয়ে হাত বাঁধার পরামর্শ দিল গিলটি মিয়া। 'কিন্তু সাবদান! মজবুত না হলে বহুত খারাপী আচে তোমার পোড়া কপালে।'

নীরবে নির্দেশটা পালন করল যুবক। বাঁধন পরখ করে দেখল গিল্টি মিয়া। 'হয়েচে। এবার কেডসের ফিতে খুলে পা বাঁধো।'

এই সময় পৌঁছল রানা। 'কি করছ?'

'রাত জেগে পাহারা দেয়ার কষ্টের হাত থেকে এনাদের উদ্ধার করচি, সার!' দাঁত বের করে হাসল ছোটখাট মানুষটা।

যুবকের কোমরে বেল্ট নেই দেখে মহাবিরক্ত হয়ে উঠল সে। একটানে শার্টের বুকের কাছের দুটো বোতাম ছিঁড়ে ফেলে দুই হাতা টেনে নামাল খানিকটা, তারপর পিছনদিকে শক্ত করে গিঁট দিয়ে দিল ও দুটো। দু'হাত বাঁধা পড়ে গেল যুবকের। এবার কেডসের ফিতে খুলে তার পা বাঁধল গিলটি মিয়া। তারপর দু'জনে মিলে দেহ দুটো টেনে হিঁচড়ে রাস্তার পাশের চওড়া ড্রেনে নামিয়ে খাড়া

দেয়ালে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিল।

সবশেষে কয়েক মুঠো ঘাস-পাতা ওদের মুখে ভরে দিয়ে যার যার রুমাল দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিল গিল্টি মিয়া।

'সাবদান!' যুবকের উদ্দেশে বলল। 'চেঁচামেচি করে লোক জড়ো করতে গিয়েচ কি মরেচ। ঘাস গলায় আঁটকে দম বন্দ হয়ে মরবে। ঠিক আচে?'

মাথা দোলাল যুবক। নিচে তাকিয়ে নাক কোঁচকাল। প্রায় কোমর সমান বৃষ্টির পানি কুল্‌কুল্‌ করে গড়িয়ে চলেছে ড্রেন দিয়ে।

ধীরগতিতে কে-কে ভবনের সামনে দিয়ে গুলশান এক নম্বর গোল চক্করের দিকে এগিয়ে গেল একটা সাদা টয়োটা সেডান। চক্করের একটু আগে, রাস্তার কিনারা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটা টেম্পোর পিছনে থেমে দাঁড়াল। টেম্পো-স্ট্যান্ড ওটা। প্রতিটার ভেতরে ঘুমিয়ে আছে কিশোর হেলপার।

লাইট অফ করে কিছুক্ষণ বসে থাকল রানা। যখন বুঝল কেউ খেয়াল করছে না ওদেরকে, তখন নেমে পড়ল। অন্য পাশ থেকে নামল গিল্টি মিয়া। রানার বাঁ কাঁধে একটা ছোট ব্যাগ, বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে ওটার স্ট্র্যাপ পেঁচিয়ে ধরে রেখেছে।

'যা যা বলেছি, সব মনে আছে তো?' বলল ও।

'কি যে বলেন, সার!' হাসল লোকটা। 'এই লাইনে আমার কাচে বরং আপনিই কচিবাবু। বত্রিশ বচর...'

'চলো তাহলে।'

অভিজাত এলাকা এটা, তাই টহল পুলিসের তৎপরতাও একটু বেশি। তাদের আনাগোনার ওপর সতর্ক নজর রেখে দ্রুত পায়ে উল্টোদিকে, এয়ারপোর্ট রোডের দিকে চলল দু'জনে। পুলিসের সাড়া পেলে ছায়ায় গা ঢাকা দেয়, তারপর আবার এগোয়। এভাবে সবার নজর এড়িয়ে একসময় কে-কে ভবনের পিছনে চলে এলো ওরা।

কল্পনাও করতে পারেনি রানা, স্বয়ং কেরামতুল্লাহ্‌ খুব কাছ থেকে নজর রেখেছে ওদের ওপর। নাইট গ্লাসের সাহায্যে ওদেরকে দেখছে সে, মুখে মিটিমিটি হাসি। 'জনাব মাসুদ রানাকে বেশ অধৈর্য মনে হচ্ছে,' মৃদু স্বরে বলল সে।

'আপনি হুকুম দিলে এখনই ওদের...'

'অস্থির হবেন না,' অমায়িক কণ্ঠে শমশের আলিকে বাধা দিল মাওলানা। 'আপনি তো নিশ্চয়ই জানেন, ধৈর্যশীলদের আল্লাহ্‌ পছন্দ করেন।'

'জ্বি।'

'ভদ্রলোক এত কষ্ট করে এলেন, অন্তত একটু সান্ত্বনা নিয়ে মরার সুযোগ তো দেবেন, নাকি?'

'জ্বি, হুজুর,' বিনয়ের সাথে হাত কচলাল শমশের।

'না হয় দু'টো রাত জেগে থাকতে হয়েছে,' ভেতরের উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে না পেরে বক্‌বক্‌ করেই চলেছে কেরামতুল্লাহ্‌, 'কষ্ট করতে হয়েছে। তাতে কি? আর একটু...'

ওদিকে ভবনটার পিছনে এসে দেয়ালঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা ও গিল্টি মিয়া। দুর্গন্ধে নাক কুঁচকে আছে ওদের। সামনের দিকটা যত পরিচ্ছন্নই হোক, এদিকের অবস্থা খুবই খারাপ। ছোটখাট একটা মাঠ রয়েছে এদিকে, আবর্জনার ডিপো। বিচ্ছিরি দুর্গন্ধে নাড়িভুঁড়ি পাক খাচ্ছে ওদের।

নির্দিষ্ট জায়গায় ছোট একটা টিনের ছাউনি দেখতে পেল রানা, একচালা। ওটার নিচে চেয়ারে বসে আছে এক গার্ড, কোলের ওপর রাইফেল রেখে ঝিমুচ্ছে। পা টিপে টিপে লোকটার পিছনে চলে এলো রানা, মাথার পিছনে ওয়ালথারের বাঁটের হিসেবী মার মেরে অন্তত ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে ঘুম পাড়িয়ে দিল তাকে। চেয়ারের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল সঙ্গে নিয়ে আসা দড়ি দিয়ে।

তিন মিনিট পর, লক্-এইড নিয়ে দশতলার ফায়ার এস্কেপের বন্ধ দরজার তালার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রানা। ইতি ঠিকই বলেছে, তালাগুলো বেশ জটিল। তবে সময় লাগলেও খুলে ফেলল ও। তারপর ব্যাগ থেকে পুরু চামড়ার তৈরি গ্লাভস পরে নিয়ে ম্যানিলা রোপের একটা কয়েল বের করল, ওটার এক মাথা সিঁড়ির রেলিঙে বেঁধে ছেড়ে দিল নিচে। জরুরী অবস্থা দেখা দিলে প্রয়োজন পড়বে।

কাজের সাথে মুখও চলছে তার। কখন কি করতে হবে সেব্যাপারে গিল্টি মিয়াকে পরামর্শ দিচ্ছে। কাজ শেষ হতে তাকে ওখানেই দাঁড় করিয়ে রেখে ঢুকে পড়ল ও। সামনে ছোট একটা করিডর, একটু এগিয়ে বাঁয়ে চলে গেছে। ইতির আঁকা ডিজাইন মুখস্থ হয়ে গেছে, কাজেই বাঁ দিকে চলল রানা চোখ সয়ে আসতে। ভেতরটা আবছা অন্ধকার, দেখতে তেমন সমস্যা হচ্ছে না।

কেরামতুল্লাহ্‌র রুমের দরজা খুলতে এক মিনিটও লাগল না, ভেতর থেকে দরজা ভিড়িয়ে দিল ও। সঙ্গে আনা পেন্সিল টর্চ জ্বেলে চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে কাজে লেগে পড়ল। মাওলানার পিসি অন করে পাসওয়ার্ড ট্যাপ করল ও, তারপর ড্রাইভে সিডিটা ভরে ইতির শেখানো কমান্ড দিতে শুরু করল।

ফ্ল্যাশ করল নির্দিষ্ট ফাইল, এর মধ্যে ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বের করে প্রস্তুত হয়ে নিয়েছে ও। পর্দায় নজর বোলাবার ফাঁকে একের পর এক ছবি তুলতে লাগল। যত দেখছে, ততই বাড়ছে বিস্ময়। প্রায় শেষ হয়ে এসেছে ফাইল, এমন সময় অদ্ভুত এক কাণ্ড ঘটল, রিভার্স করতে শুরু করল সব। পিছন থেকে আগের দিকে যাচ্ছে ফাইল।

কি ঘটছে বুঝতে না পারলেও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল রানা, সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করল। ঠিক তখনই প্যাঁচার ডাক ডেকে উঠল গিল্টি মিয়া। পুরো করতে পারল না সে ডাকটা, মাঝপথে থেমে গেল। ব্যস্ত হয়ে সিডি বের করার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু হলো না। কেন যেন আটকে গেছে ড্রাইভ। খুলছে না।

ক্যামেরা ব্যাগে ভরে ঘুরে দাঁড়াল ও, দরকার নেই সিডির। যা তথ্য পাওয়া গেছে, তাতেই মাওলানার···দপ্ করে আলো জ্বলে উঠল রুমে। আঁতকে উঠল ও, দরজা পর্যন্ত এসে ব্রেক কষল। বাইরের ধাক্কায় দড়াম করে খুলে গেল ওটা।

সামনেই দাঁড়িয়ে আছে মাওলানা কেরামতুল্লাহ্!

দুই হাত কোমরে, মুখে মিটিমিটি হাসি। তার দু'পাশে আরও কয়েকজন

দাঁড়িয়ে, প্রত্যেকের হাতে ম্যাকারভ পিস্তল। গিল্টি মিয়াকে সবার পিছনে দেখা গেল। দাঁড়িয়ে নেই সে, কেউ একজন পিছন থেকে কলার ধরে খাড়া রেখেছে। ডান চোয়াল ফুলে আছে তার, নীল হয়ে আছে খানিকটা জায়গা।

তাকে ধরে থাকা লোকটাকে নিঃশব্দে হাসতে দেখল ও। গালে চাপদাড়ি তার, বাঁ চোখের নিচে ইঞ্চি দুয়েক লম্বা কাটা দাগ। মাওলানার দিকে ফিরল ও, হাসি আরও চওড়া হয়েছে তার।

'শেষ পর্যন্ত ধরা পড়তেই হলো, জনাব মাসুদ রানা!' দুঃখ প্রকাশের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সে ডানে-বাঁয়ে। 'আমি জানতাম আপনি আসবেন। তাই তৈরি হয়ে ছিলাম, যাতে এলে আপনাকে অভ্যর্থনা জানাতে পারি।'

মুহূর্তে চেহারা কঠোর, শীতল হয়ে উঠল। 'অস্ত্রটা ফেলে দিন, শুধু শুধু কোমরে গুঁজে রেখেছেন ওটা। শমশের আলি, পিস্তলটা নিয়ে নিন। ব্যাগটাও।'

'জ্বি, হুজুর!' গিল্টি মিয়ার ভার অন্য একজনের হাতে তুলে দিয়ে অস্ত্র বাগিয়ে কাছে চলে এলো লোকটা। চোখেমুখে বিজয়ের হাসি। দুই ঝট্‌কায় ওকে ভারমুক্ত করে পিছিয়ে গেল সে। খুব কাছ থেকে কাজলের খুনীটাকে দেখল রানা। ইচ্ছে হলো এক টানে ওর টুঁটি ছিঁড়ে ফেলে, কিন্তু সংযত রাখল নিজেকে। এখন কিছু করতে গেলে কপালে দুঃখ ছাড়া আর কিছু জুটবে না।

'যা যা জানতে এসেছিলেন, পেরেছেন জানতে?' মাথা দোলাল কেরামতুল্লাহ্। 'যাতে জানতে পারেন, তার ব্যবস্থা করেই রেখেছিলাম আমি। মৃত্যুর আগে কারও অন্তিম ইচ্ছা পূরণ করা···'

'কার মৃত্যুর কথা বলছ, তোমার?' বাধা দিল ও।

হেসে উঠল লোকটা, কিন্তু মুখের লাল হয়ে ওঠা চোখ এড়াল না কারও। 'বেআদব, বেতমিজ! লোকটা ভদ্র ভাষায় কথা বলতে শেখেনি।'

'শিখেছি। কিন্তু যা মানুষের সাথে ব্যবহার করি, তুমি তা আশা করতে পারো না। তোমার যে পরিচয় পেয়েছি, তাতে আমার ধারণা হয়েছে, তুমি মানুষ রূপী হায়েনা একটা। নরকের কীট!'

এবার টকটকে লাল হয়ে উঠল তার চেহারা। তবে মনের বল যথেষ্ট আছে কেরামতুল্লাহ্‌র, দ্রুত সামলে নিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু রানা বাধা দিল। 'যদি ভেবে থাকো আমাদের দু'জনকে মেরে ফেললেই বেঁচে যাবে, তো তাই করো। তারপর দেখো কি ঘটে।'

'কিছুই ঘটবে না, আমি জানি। কারণ আমার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নেই সরকারের হাতে।'

'তা বটে,' বাঁকা হাসি ফুটল ওর মুখে। 'সরকার তোমার মত ছাগল কি না, চোখ বুজে ঘাস চিবায়। তুমি কোথায় কি করে বেড়াচ্ছ, সবকিছুর জলজ্যান্ত প্রমাণ রয়েছে আমাদের হাতে, কেরামতুল্লাহ্। তোমার রেহাই নেই।'

'ছাগল' বা 'ঘাস' কোন প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারল না তার মধ্যে। 'আমি জানি আপনাদের জানার দৌড় কতখানি। সেজন্যেই তো বললাম, আপনি যাতে মরার আগে আমার সমস্ত প্ল্যান জেনে যেতে পারেন, আমিই সে ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম! এখন ওসব,' নিজের মাথায় টোকা দিল লোকটা, 'এখানে নিয়ে

সোজা কবরে যাবেন। এদিকে আমার কম্পিউটার থেকে তথ্যগুলো এতক্ষণে সম্পূর্ণ মুছে গেছে, আর কোথাও নতুন করে জমা করেছি আমি ওসব। এখন যদি সরকারের তরফ থেকে তদন্ত হয়, কিছুই খুঁজে পাবে না তারা। তো বুঝতেই পারছেন, কেউ আমার কিছু করতে পারবে না।'

'এত নিশ্চিত হয়ে কথা বোলো না। আমরা জানি তোমার রুশ অস্ত্রশস্ত্র কার মাধ্যমে আসে। সেদিন মহাখালিতে যে অস্ত্র ব্যবহার করেছে তোমার লোকেরা, সেটা কার আবিষ্কার তাও জানি আমরা। গত তিন বছরে খায়রুল কবীর কতবার বাংলাদেশে এসেছে, তাও,' নির্বিকার চেহারায় বলল ও।

চেহারা বদলে যেতে শুরু করল কেরামতুল্লাহ্‌র। ভুরু কুঁচকে উঠেছে চিন্তায়। 'কার কথা বলছ তুমি?'

'এখনও ভান করছ? কোন লাভ নেই। খায়রুল কবীর বাংলাদেশের সবচেয়ে ওয়ান্টেড কালপ্রিট। তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে অনেক আগেই নিজের কবর খুঁড়েছ তুমি, তোমার সাথে আর যারা আছে, তারাও। এখন সময় হয়েছে, ঘাড় ধরে কবরে নামিয়ে দেয়া হবে তোমাদেরকে। খায়রুল কবীরকেও।'

চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে মাওলানার। চাউনি স্থিরতা হারিয়ে এদিক-ওদিক করতে শুরু করেছে। অস্থির। 'খায়রুল কবীর…ও বুঝেছি! কে-কের নাম তাহলে…'

এবার রানার অবাক হওয়ার পালা। মাওলানার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে নিজেও এতদিন শুধু কে-কে বলে জানত তাকে। আসল নাম এইমাত্র জানল। ইচ্ছে করে সংক্ষেপে ডাকত তা নয়, জানত না বলে ডাকত।

'সে কি?' অবাক হলো রানা। 'এতদিন যার সাথে হাত মিলিয়ে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলে, তার নামটাই জানো না?' হেসে উঠল। 'এতক্ষণ ভেবেছিলাম তুমি ছাগল, এখন দেখছি দাড়ি সহ আস্ত একটা রামছাগল।'

এবার একটু প্রতিক্রিয়া ঘটল কেরামতুল্লাহ্‌র মধ্যে। তমিজ ভুলে গেল সে। 'লোকটা সম্পর্কে কি জানো তোমরা, মাসুদ রানা?'

'তোমাকে আমি তাই বলি এখন! পাগল হয়েছ! গাছ থেকে যখন মাটিতে পড়বে, তখন ঠিকই জেনে যাবে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল লোকটা, তারপর নড়ে উঠল। 'শমশের আলি, এদের ঘাঁটিতে নিয়ে চলুন। কিছু করার আগে কথা আদায় করতে হবে। চোখ বেঁধে নিন। কারও ওপর এদের গাড়িটার দায়িত্ব তুলে দিন, দূরে কোথাও রেখে আসতে হবে ওটাকে।'

'জ্বি, হুজুর।'

'এই লোকের ব্যাপারে হাজারগুণ সতর্ক থাকবেন এবার,' রানাকে দেখাল সে। 'এবারের সুযোগ যাতে কোনমতেই হাতছাড়া না হয়।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, হুজুর,' তাচ্ছিল্যের সাথে হাসল বিহারী। 'একবার যখন হাতের মুঠোয় পেয়েছি, তখন আর ভাবতে হবে না আপনাকে।'

মাওলানা নিজের রুমে ঢুকে গেল। এদিকে রানা ও গিল্টি মিয়াকে বেঁধে ফেলা হলো পিছমোড়া করে। বাঁধন পরীক্ষা করে দেখল রানা, বাড়তি একচুল

নড়াচড়ার উপায় নেই। বোঝা গেল এ সম্পর্কে জ্ঞান ভালই রাখে এরা।

পাঁচ মিনিট পর ওদেরকে ভবনের আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কে নিয়ে আসা হলো লিফটে করে। একটা মাইক্রোবাসে তোলা হলো। ওটার ড্রাইভিং সীটে বসল শমশের আলি। দু'মিনিট পর কে-কে ভবন ছেড়ে এয়ারপোর্ট রোডের দিকে চলল মাইক্রোবাস, তারপর ডানে ঘুরে টঙ্গির দিকে।

মাঝখানের সীটে বসানো হয়েছে ওদের দু'জনকে। দু'পাশে দুই সশস্ত্র খাদেম, ওদের পেটে অস্ত্র ঠেসে ধরে বসে আছে। দু'জন রয়েছে পিছনে, তাদের অস্ত্রও যে কোন পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রস্তুত। আরও একজন বসেছে শমশের আলির পাশে।

ঢাকা গেট পেরিয়ে এসেছে গাড়ি, অনুমান করল রানা। গিল্টি মিয়ার জ্ঞান আছে কি না বোঝার জন্যে ডাকল ও। সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল সে। 'কি যে বলেন, সার! এদের মারও একটা মার, তেলচোট্টাও একটা পাকি! এসব আমার গায়েই লাগে না। হ্যাঁ, জীবনে মার খেয়েচি শামসুদ্দিন দারোগার হাতে। ওফ্, সে কতা...'

'অ্যাই, চোপ্!' ধমক লাগাল শমশের আলি। 'কথা বলবে না কেউ।'

পাত্তা দিল না গিল্টি মিয়া। 'এদের বুদ্ধি আচে, সার। আমি চেয়ে আচি নিচের দিকে, কেউ আসে কি না দেখচি। ওমা! এলো কি না ওপর থেকে! কিচু বুজতেই পারিনি।'

হো-হো করে হেসে উঠল শমশের আলি। 'বোঝো তাহলে কার সাথে লাগতে এসেছ তোমরা! এই বুদ্ধি নিয়ে হুজুরের সাথে পাঞ্জা লড়ার সাধ হয়েছিল তোমাদের!'

দশ

একটানা দশ মিনিট সোজা ছুটল মাইক্রোবাস। তারপর দোল খেয়ে একটু উঁচু হলো, আওয়াজ বদলে গেল—রানা বুঝল টঙ্গী ব্রিজ পার হচ্ছে। ব্রিজ থেকে নেমে আবার ছুটল ঝড়ের গতিতে। মিনিট পনেরো পর খানিকটা জায়গা নিয়ে পরপর কয়েকটা চক্কর খেল। তারপর আবার সোজা দৌড়।

ব্যাপার টের পেয়ে মনে মনে হাসল রানা। ওকে বিভ্রান্ত করার জন্যে জয়দেবপুর গোলচক্কর ঘিরে চক্কর দিয়েছে এতক্ষণ শমশের আলি, এখন আবার টঙ্গীর দিকে ফিরে চলেছে। এবার ভদ্রগতিতে মিনিট দশেক চলে পাকা রাস্তা ছেড়ে নেমে পড়ল গাড়ি, এবড়োখেবড়ো পথ ধরে নাচতে নাচতে এগোল। বেশ কিছুক্ষণ পর থেমে দাঁড়াল, পিছনে একটা স্লাইডিং গেট বন্ধ হওয়ার শব্দ উঠল।

মাইক্রোবাসের গেটও খুলল, বাম বাহুতে টান পড়ল রানার। 'নামেন!' ধরে নামানো হলো ওদেরকে, খুলে দেয়া হলো চোখের বাঁধন। পিট্ পিট্ করে তাকাল রানা। মাথার ওপরে তারের মাথায় একটা শেডবিহীন বালব্ জ্বলছে,

লালচে আলো ছড়াচ্ছে ওটা।

চারদিক তাকাল রানা। এটা একটা গ্যারেজ, অনেক বড়। ওদেরকে বয়ে নিয়ে আসা মাইক্রোবাস ছাড়া আরও কয়েকটা গাড়ি আছে ভেতরে। দুটো অচল গাড়িও আছে, এক কোনায় পড়ে আছে অযত্নে।

পিছন থেকে ধাক্কা মারল শমশের আলি। 'হাঁটেন!' একটা খোলা দরজা ইঙ্গিত করে গিল্টি মিয়ার দিকে ফিরল। টিট্‌কিরি মারার ভঙ্গিতে বলল, 'আইয়ে জানাব। তাশরিফ লাইয়ে।'

বড়সড় এক রুমে নিয়ে আসা হলো ওদেরকে। মেঝে ও দেয়াল পাকা, ওপরে টিনের চাল। রুমের এক মাথায় বড় এক টেবিলের ওপাশে বসে আছে মাওলানা কেরামতুল্লাহ্। তার এক পাশে চেহারায় না হলেও গেট-আপ সেট-আপে একইরকম আরেকজন বসা! কুদরতুল্লাহ্, ভাবল রানা। অন্যপাশে আরও দু'জন বসা। একজন চাপদাড়িওয়ালা, সুদর্শন। অন্যজন স্রেফ জলহস্তীর খুদে সংস্করণ।

'ইনি হচ্ছেন সেই লোক,' হাসিমুখে অন্যদের সাথে রানাকে পরিচয় করিয়ে দিল কেরামতুল্লাহ্। 'আর উনি...' গিল্টি মিয়ার দিকে তাকিয়ে থেমে গেল। 'আপনার নামটা জানতে পারি?'

'নিচ্চয় পারেন,' মাথা দোলাল সে। 'আমার নাম গিল্টি মিয়া।'

হাসতে গিয়েও নিজেকে সংযত করল কেরামতুল্লাহ্। বিস্মিত চেহারায় বলল, 'ঠাট্টা করছেন মনে হয়!'

'লে হালুয়া! ঠাট্টা করব কেন? নাম জানতে চেয়েচেন, তাই বলেচি। এর মদ্যে ঠাট্টার তো কিচু দেকচিনে!'

ধীরে ধীরে হাসি ফুটল কেরামতুল্লাহর মুখে। গিল্টি মিয়ার সহজ সরল চাউনি দেখে বিশ্বাস করেছে কথাটা। 'গিল্টি মিয়া? বাহ্, গিল্টিই বটে! নামের সাথে আপনার কাজের অদ্ভুত মিল।'

'নয়তো কি অমনি অমনি এই নাম হয়েচে?' বলল সে। 'মিল আচে বলেই না এই নাম রেকেচেন আমার ওস্তাদ।'

'বেশ বেশ। শমশের আলি, ওনাদের বসতে দিন। অনেক কাজ পড়ে আছে।'

লোকগুলোর মুখোমুখি দুই চেয়ারে বসতে দেয়া হলো ওদেরকে, দু'হাত মজবুত করে বেঁধে ফেলা হলো চেয়ারের সাথে। নড়াচড়া করার চেষ্টা করে দেখল রানা, সুবিধে হলো না। নিখুঁত কাজ। নড়তে গেলে বাঁধন কেটে বসে। কাজ শেষ করে রানার পিছনে দাঁড়াল শমশের, স্ট্যান্ড অ্যাট ইজ হয়ে। কিছুটা দূরে কোথাও একটা শেয়াল ডেকে উঠল, তারপর একযোগে আরও কয়েকটা।

'জনাব মাসুদ রানা,' কেরামতুল্লাহ্ বলে উঠল। 'আমি এক কথার এবং সোজা পথে চলার মানুষ। সেটা কার নজরে কেমন জানি না, জানতে চাইও না। আমার কাছে আমার পথই সেরা। যখন যে নিয়ত করি, তাকে কামিয়াব করার জন্যে চেষ্টা করি এবং শেষ পর্যন্ত ফলও পাই। জীবনে কখনও ব্যর্থ হইনি আমি, এবারও হব না।

'তাই ভাবছ বুঝি?' মুচকে হাসল রানা।

'ভাবছি না,' তৎক্ষণাৎ জবাব দিল সে। 'আমি জানি। কাজেই অহেতুক আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবার চেষ্টা করবেন না। যা প্রশ্ন করব, দয়া করে এবং সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি উত্তর দেবেন। তাতে ঝুট ঝামেলা এড়িয়ে সহজে সিদ্ধান্তে পৌঁছে যেতে পারব আমি। আপনারাও তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবেন।'

'কোন্ মুক্তির কথা বলছ তুমি, কেরামতুল্লাহ?' রানা বলল।

'না!' সঙ্গে সঙ্গে কড়া গলায় ধমক লাগাল লোকটা। নজর পিছনে, শমশের আলির ওপর। 'আমি না বলা পর্যন্ত কারও গায়ে হাত তুলবেন না।'

'জ্বি, হুজুর,' মিনমিনে গলায় বলল লোকটা।

ঘাড় ঘুরিয়ে কৌতূহলের দৃষ্টিতে লোকটাকে দেখল রানা। 'তোমারই নাম তাহলে শমশের আলি?'

'হাঁ,' অজান্তেই বলে উঠল সে।

'তোমার সাথে দেখা হওয়ায় ভালই হলো।'

'কিউঁ?' বিস্ময়ে মুখ দিয়ে মাতৃভাষা বেরিয়ে গেল তার।

'ইতিকে আমি কথা দিয়ে এসেছি, কাজলের খুনীকে নিজ হাতে খুন করব আমি, তাই,' বলল ও। 'কাজল হত্যার প্রতিশোধ নেব।'

বোকার মত তাকিয়ে থাকল বিহারী লোকটা। ব্যাপার বুঝলেও সংযোগটা কোথায় বুঝতে পারেনি। কাজলের সাথে ইতির বা তার সাথে মাসুদ রানার প্রতিজ্ঞার কি সম্পর্ক, মাথায় খেলছে না। কেরামতুল্লাহ্ সাহায্য করল তাকে।

'ইতি? মানে, তাসমিনের কথা বলছেন আপনি, জনাব?' প্রশ্ন করল সে।

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু ওকে কাজল হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার কথা কেন দিতে হলো আপনাকে?'

'কারণ কাজল ইতির স্বামী ছিল,' বলল ও।

চেহারায় নিখাদ বিস্ময় ফুটল উপস্থিত প্রত্যেকের, পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল লোকগুলো। মাওলানা সামলে নিল সবার আগে। 'আচ্ছা-আ!' টেনে বলল। 'এইবার বুঝলাম!'

হেসে উঠল রানা। 'কিছুই বোঝোনি তুমি এখনও, কাঠমোল্লা! বুঝলে এই মুহূর্তে মূর্ছা যেতে।'

রেগে উঠতে গিয়েও শেষ সময়ে সামলে নিল লোকটা, এক খিলি সুগন্ধী পান মুখে পুরে চিবুতে লাগল। 'ফালতু কথায় সময় নষ্ট হচ্ছে, এবার কিছু কাজের কথা হোক।'

'হোক,' সঙ্গে সঙ্গে বলল রানা।

চট্ করে ভুরু কুঁচকে উঠল কেরামতুল্লাহর। 'জনাব মাসুদ রানা,' রাগ রাগ গলায় বলল। 'আমি যা প্রশ্ন করব, তার উত্তর দিতে হবে আপনাকে। বুঝতে পেরেছেন?'

ঠোঁট উল্টে মাথা নাড়ল রানা—পারেনি।

তার পাশে বসা চাপদাড়ি ও জলহস্তীর চেহারায় রাগের লক্ষণ ফুটল।

প্রথমজন তার কানে কানে কিছু বলতে মাথা ঝাঁকাল। চাপা কণ্ঠে বলল, 'ধৈর্য ধরো।'

হাতঘড়িতে চোখ বুলিয়ে রানাকে শীতল চোখে মাপতে শুরু করল সে। চাউনি বদলে গেছে, ঠাণ্ডা মেরে গেছে একদম। 'খায়রুল কবীর সম্পর্কে কি জানেন, মাসুদ রানা?'

'সে সব স্টেট সিক্রেট, তোমাকে বলা যাবে না।'

'অর্থাৎ, বলবেন না?'

হাসল ও। 'ভালই আবদার ধরেছ। গাঁটছড়া বাঁধার সময় সে সব জেনে নিতে মনে ছিল না? এখন জেনে কোন লাভও নেই তোমার। নিজের সর্বনাশ যা করার করে ফেলেছ। তোমার কপালের লিখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আমি, শেষ মুহূর্তে ওর হাতেই মৃত্যু লেখা আছে তোমার।'

'সময় আসুক, তখন দেখা যাবে কে কার হাতে মরে। আপনি আমাদের সম্পর্কে কি জানেন?'

'সবই জানি,' বলল রানা। 'কতজন খাদেম আছে তোমার, তাদেরকে প্রতিমাসে কত করে ভাতা দাও...'

হাসিমুখে সঙ্গীদের দিকে ফিরল কেরামতুল্লাহ। 'কোন প্রমাণ আছে এ সবের? কোর্টকে বলে বিশ্বাস করাতে পারবেন?'

'কোর্ট!' বিস্মিত হওয়ার ভান করল রানা। 'কোর্টে কে যাচ্ছে, আহাম্মক কোথাকার! প্রমাণ নষ্ট করে কোর্টের ঝামেলা থেকে তুমি নিজেই বাঁচিয়ে দিয়েছ আমাদেরকে। এখন প্রথম সুযোগেই তোমাকে তোমার সঙ্গীসাথীসহ গুলি করে মেরে ফেলা হবে। সেটাই হবে তোমাদের ন্যায্য পাওনা,' নির্বিকার চিত্তে একগাদা মিথ্যে বলে গেল ও।

রাগল না লোকটা, বরং হাসল। 'সে সুযোগ তোমরা পাচ্ছ না, মাসুদ রানা। আর কয়েক দিনের মধ্যে গদি উল্টে যাবে সরকারের, তখন আমরা বসব ওটায়। তখন বরং তুমি...'

'জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছ তুমি, মোল্লা কেরামতুল্লাহ। তোমার কেরামতীর দিন শেষ। অত সময় দেয়া হবে না তোমাদেরকে। অপেক্ষা করো। তোমাদের ঘাঁটি কোথায় আমরা জানি। আজ রাতেই এয়ারফোর্সের বম্বার প্লেন গিয়ে সবকিছু ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে আসবে।'

এবার চেহারায় উদ্বেগ ফুটল কেরামতুল্লাহর। 'অসম্ভব! ওটা মায়ানমারে। অন্য একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশের ওপর বিনা যুদ্ধে হামলা চালাতে পারে না এদেশের বিমান!'

হাসি চওড়া হলো রানার। 'এদেশের প্লেন না কোন্ দেশের কে জানছে? প্লেন দেখে চিনতে পারলে তো?' মাথা নাড়ল ও। 'পারবে না, কারণ আমাদের প্লেনের সমস্ত মার্কিং ঢাকা থাকবে। মগের মুলুক যতই চেঁচামেচি করুক, কিচ্ছু করতে পারবে না। বাংলাদেশ সরকার সরাসরি অস্বীকার করবে এসবের সাথে জড়িত থাকার কথা।'

কয়েকবার মুখ খোলার চেষ্টা করল কেরামতুল্লাহ্, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অসম্ভব

বুঝতে পেরে হাল ছেড়ে দিল। সঙ্গীদের দিকে তাকাল একে একে। তাদের চেহারা হয়েছে অবর্ণনীয়। জলহস্তী ঘামছে দরদর করে। ভয়ে মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে।

'তোমাদের কেউ রেহাই পাবে না। আগেই যদি মৃত্যু না হয়, তাহলে তুমি,' কেরামতুল্লাহকে বলল ও, 'সরাসরি দেশদ্রোহিতার অভিযোগে ফাঁসীতে ঝুলবে।' অন্য দু'জনকে দেখল। 'আর একে প্রত্যক্ষ সহযোগিতার অভিযোগে তোমাদেরও একই পরিণতি হবে।'

'মিথ্যে বলছে লোকটা!' চাপ দাড়ি বলে উঠল। 'ও আমাদের ভয় দেখাতে চাইছে। মনে হয় ওর পেছনে শুধু শুধুই সময় নষ্ট করছি আমরা।'

'আমারও তাই মনে হয়। তাহলে আপনি মুখ খুলছেন না, জনাব মাসুদ রানা?'

'এত কথার পরও যদি তোমার মনে হয় আমি মুখ বুজে আছি, আমার কি করার আছে বলো?' কাঁধ ঝাঁকাল ও।

'বেশ। শমশের আলি, এদের খানিক খাতির করার জন্য নিয়ে যান। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মুখ খোলাতে হবে এই লোকটার।'

আনন্দে চক্‌চক্ করে উঠল লোকটার দু'চোখ। 'জ্বি, হুজুর।'

'আর কিছুক্ষণের মধ্যে কে-কে আসছে। আসুক আগে। তারপর প্রয়োজন বুঝলে অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।'

'জ্বি।'

বাঁধন খুলে পাশের রুমে নিয়ে আসা হলো রানা ও গিল্টি মিয়াকে। এটা ছোট। শমশের আলির দুই চ্যালা এক মাথার দেয়ালঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা একটা বুক শেলফ ধরে টান দিতেই দরজার পাল্লার মত এগিয়ে এলো ওটার একদিক। ট্র্যাপ ডোর! ও পাশে আরেকটা ছোট রুম।

ওর ভেতরটায় এক পলক চোখ বুলিয়ে ভয় ধরে গেল রানার। নমুনা দেখেই বোঝা যায় ওটা টর্চার চেম্বার। ঠেলে ওর মধ্যে ঢোকানো হলো ওদেরকে। রুমের এক কোণে মেঝেতে মধ্যযুগীয় নির্যাতনের কিছু যন্ত্রপাতি, আর একটা দেয়ালে মাথা বরাবর উঁচুতে পাশাপাশি দুটো চওড়া কাঠের আড়া দেখতে পেল রানা। আড়ার দু'মাথায় দড়ি ঝুলছে। ওগুলো কি কাজে ব্যবহার হয় বুঝতে পেরে আঁতকে উঠল গিল্টি মিয়া। 'এই সেরেচে! খাতিরের নাম করে এ কোতায় লিয়ে এলো ব্যাটারা?'

'দাঁড়াও!' শমশের আলির মুখে হাসি ফুটল। 'এখনই দেখতে পাবে। এটাকে বাঁধো ওখানে,' প্রথমে রানাকে দেখাল সে, তারপর দেয়ালের একটা আড়া। আড়ার দু'মাথায় দড়ি ঝুলছে।

আড়ার নিচে দাঁড় করানো হলো রানাকে, দু'মাথার দড়ি দিয়ে দু'হাতের কবজি কষে বাঁধা হলো। পা দুটো বাঁধা হলো নিচের দুই মোটা কড়ার সাথে। গিল্টি মিয়াকে তেমন একটা পাত্তা দিল না শমশের আলি, একটা চেয়ারে দু'হাত বেঁধে বসিয়ে রাখতে বলে রানার দিকে ফিরল।

'তারপর?' দু'হাতের তালু ঘষল সে জোরে জোরে। 'আমাকে তুমি নিজ হাতে

খুন করবে, কেমন?'

ঢোক গিলল রানা। 'হ্যাঁ।'

'যদি বেঁচে থাকো, তবেই তো? কিন্তু থাকবে না, সে ওয়াদা দিতে পারি আমি।'

ওর বাঁ চোয়াল সই করে দড়াম করে মারল লোকটা। বন্‌বন্ করে মাথা ঘুরে উঠল, চোখের সামনে সব কিছু পাক খেতে লাগল রানার। মনে হলো ঘিলু নড়ে গেছে বুঝি। পরের বাঁ হাতি ঘুসিটা ভয়ঙ্কর গতিতে আছড়ে পড়ল সোলার প্লেক্সাসে। দম নেয়ারও সুযোগ দিচ্ছে না লোকটা, মেরেই চলছে দমাদম।

তিন মিনিটে জ্ঞান হারাল মাসুদ রানা।

প্রায় তখনই ট্র্যাপ ডোর খুলে উঁকি দিল কেরামতুল্লাহ্। 'কি অবস্থা?'

'মনে হয় বেহুঁশ হয়ে গেছে, হুজুর!' হাঁপাতে হাঁপাতে ঘুরে তাকাল শমশের আলি।

'থাকুক ওভাবে। আপনারা চলে আসুন, অন্য কাজ আছে,' বলে গিল্টি মিয়ার দিকে ফিরল সে। 'ওকেও বেঁধেছেন তো ঠিকমত?'

'জ্বি হুজুর,' শমশেরের চ্যালাদের একজন বলল।

'ঠিক আছে, এখন আসুন সবাই। এদিকে একটু পরে নজর দেয়া যাবে।'

কপালের ঘাম মুছে রানাকে এক পলক দেখল শমশের, তারপর যেন প্রচণ্ড অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘুরে দাঁড়াল। 'আও তুমলোগ।'

বাইরে থেকে শেলফটা টেনে দিয়ে চলে গেল শেষেরজন।

ব্যাপারটা প্রথমে বিশ্বাসই হচ্ছিল না গিল্টি মিয়ার, খানিক পর হুঁশ হতে নিজের বাঁধন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আকার আকৃতির জন্যে প্রায় সময়ই একটা বিশেষ প্রাপ্তি ঘটে থাকে তার, সেটা হলো মানুষের অবহেলা। তার মত ছোটখাট, নিরীহদর্শন মানুষ কারও বড় ক্ষতি করতে পারে, কেউ তা চিন্তাই করে না।

এবারও তাই হয়েছে, বাঁধা তাকে হয়েছে ঠিকই, তবে তেমন শক্ত করে নয়। চেয়ারের হাতলের সাথে কেবল হাত দুটো বাঁধা হয়েছে। অল্প চেষ্টাতেই তা খুলে ফেলল গিল্টি মিয়া, ট্র্যাপ ডোরের ওপাশে কোন শব্দ ওঠে কি না, সেদিকে কান খাড়া। দ্রুত রানার পায়ের বাঁধন খুলে দিল সে।

এরপর নজর দিল ওর হাতের দিকে। হাতের সাথে মুখও চলছে সমানে, মনে মনে শমশের আলির চোদ্দ গুষ্টি উদ্ধার করছে ক্যালকাটার অকথ্য, অশ্রাব্য বাংলায়। সে পর্ব সেরে রানার কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্ করে ডাকতে লাগল, 'উঠুন, সার! উঠে পড়ুন! ব্যাটারা ফিরে আসতে পারে যে কোন মুহূর্তে।'

হাত বাঁধা থাকায় হাঁটু ভাঙা অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিল রানা, এক হাত খোলা হতেই দেহটা একদিকে গড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে দেখে কাঁধ দিয়ে ঠেকাল সে। 'আহাহা! একোন শোয়ার সময় নয়, উঠে পড়ুন, সার। ওরা দেকে ফেললে সব্বোনাশ হয়ে যাবে।'

কথার সাথে ওকে ধরে জোরে জোরে ঝাঁকাতে লাগল গিল্টি মিয়া। কয়েক ঝাঁকিতেই কাজ হলো, গুঙিয়ে উঠে চোখ মেলল রানা। আবছা নজরে মুখের একদম সামনে গিল্টি মিয়ার মুখটা দেখে ধড়মড় করে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'তুমি!' বলেই অসহ্য মাথা ব্যথায় চোখমুখ কোঁচকাল।

'আস্তে বলুন, সার; শুনে ফেলবে!' দুই কথায় ওকে পরিস্থিতি বুঝিয়ে বলল গিল্টি মিয়া।

সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণোদ্যমে চালু হয়ে গেল রানার মাথা। দ্রুত চারদিকে তাকাল অস্ত্রের খোঁজে—নেই কিছু। মধ্যযুগীয় নির্যাতনের যেসব যন্ত্রপাতি আছে, তার মধ্যে থেকে একটা বড় হাতুড়ি বেছে নিল আর কিছু না পেয়ে। ওটা গিল্টি মিয়ার হাতে ধরিয়ে দিয়ে জুতোর হিলের বিশেষ কুঠুরি থেকে ওয়ালথারের মত ওর প্রতি মুহূর্তের আরেক সঙ্গী, চার ইঞ্চি ব্লেডের একটা ফোল্ডিং নাইফ বের করল মাসুদ রানা।

গিল্টি মিয়ার সাথে নিচু গলায় আলোচনা করল কয়েক সেকেন্ড, কি করতে হবে লোকটাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে ঘরের একমাত্র বাল্বটা ছুরি দিয়ে ঠুকে ভেঙে দিল ও। অন্ধকারে ডুবে গেল রুম। এরপর প্রতীক্ষার পালা। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও ওদের কেউ আসছে না দেখে বিরক্ত হয়ে নতুন প্ল্যান আঁটতে শুরু করেছিল রানা, তখনই কথার আওয়াজ উঠল ট্র্যাপ ডোরের ওপাশে। কয়েকটা গলা কথা বলছে। এগিয়ে আসছে। ছিলার মত টান্‌টান্‌ হয়ে উঠল রানার সমস্ত পেশী।

খায়রুল কবীর! লোকটার গলা শুনতে পেয়েছে ও।

কয়েক মুহূর্ত পর ট্র্যাপ্‌ ডোর খুলে গেল। পরক্ষণে শমশের আলির বিস্মিত গলা শোনা গেল। 'এ কি! অন্ধকার কেন ভেতরে? মাসুদ···ওহ্‌!' পিছন থেকে আসা আলোয় আবছা ভাবে ওদের দুজনকে জায়গামত দেখে হাঁপ ছাড়ল সে। 'যাক্‌, আছে ব্যাটারা!'

লোকটার পিছনে বেশ কয়েকজনকে দেখতে পেল রানা। কেরামতুল্লাহ্‌, ঘুমে ঢুলুঢুলু কুদরতুল্লাহ্‌, চাপদাড়ি ও জলহস্তী, তিন-চারজন খাদেম এবং খায়রুল কবীর। উঁকিঝুঁকি মেরে ভেতরটা দেখার চেষ্টা করছে সে।

'একটা বালব্‌ নিয়ে এসো কেউ,' শমশের আলি হুকুম দিল।

খাদেমদের একজন সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে চলে গেল, এদিকে নির্ভয়ে ভেতরে চলে এলো শমশের আলি। দুই সাগরেদ রয়েছে সাথে, একজনের হাতে ম্যাকারভ। গিল্টি মিয়ার সামান্য বাঁয়ে দাঁড়িয়ে বাল্বের ঝুলন্ত হোল্ডারটা দেখার চেষ্টা করতে লাগল বিহারী। 'নিভল কি ভাবে?' বিড়বিড় করে বলল সে।

'এইভাবে,' বলেই চেয়ারের অন্যপাশে দাঁড় করিয়ে রাখা হাতুড়িটা এক ঝট্‌কায় তুলে নিল গিল্টি মিয়া। গায়ের জোরে মেরে বসল অস্ত্রধারী খাদেমের বুকে। মড়াৎ শব্দ করে ভাঙল হাড়, বুক ভাঙা, বিকট চিৎকার করে পিছিয়ে গেল খাদেম। অস্ত্র ছেড়ে দু'হাতে বুক চেপে ধরে মেঝেতে গড়াগড়ি খেতে লাগল।

একই মুহূর্তে 'হ্যান্ডস আপ' অবস্থা থেকে বিদ্যুৎ গতিতে লাফ দিল রানা, খাদেমের ফেলে দেয়া পিস্তলের ওপর পড়েই তুলে নিল ওটা, চোখের পলকে গুলি করল। বিকট শব্দে কেঁপে উঠল টর্চার চেম্বার।

হতভম্ব শমশের আলির থুত্‌নির নিচ দিয়ে ঢুকল গুলিটা, বেরিয়ে গেল খুলি ফুটো করে । ধড়াস্‌ করে আছড়ে পড়ল লোকটা লাশ হয়ে। এত সহজে ব্যাটাকে

রেহাই দেয়ার ইচ্ছে ছিল না রানার, কিন্তু এরকম মুহূর্তে এর বেশি কিছু করার উপায়ও ছিল না। ওদিকে ততক্ষণে হাতুড়ির আরেক বাড়িতে দ্বিতীয় খাদেমের এক হাঁটুর বাটি গুঁড়ো করে দিয়েছে গিল্টি মিয়া। বুকের ব্যথায় কাতর সতীর্থের পাশে শুয়ে হাঁটু চেপে ধরে করুণ কণ্ঠে বাপ-মাকে স্মরণ করছে সে।

অন্যদিকে গুলির শব্দে আঁতকে উঠল বাইরে অপেক্ষমাণ দলটা, মুহূর্তে ঘুরে দৌড় দিল সন্ত্রস্ত ইঁদুরের মত। খায়রুল কবীরকে চরকির মত ঘুরে দাঁড়াতে দেখল রানা। পরক্ষণে একলাফে চোখের আড়ালে চলে গেল সে। অন্যেরা কে কার আগে পালাবে, সেই প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত। কেরামতুল্লাহ্ চিৎকার করে লোকজন ডাকছে।

এই সময় আবার গুলি হলো। তৃতীয় খাদেম ট্র্যাপ ডোরের মুখে দাঁড়িয়ে আন্দাজে গুলি করছে। দ্বিতীয় গুলিতে তাকে ঠাণ্ডা করে দিয়ে ম্যাকারভ বাগিয়ে ছুটল রানা। বেরিয়েই কেরামতুল্লাহ্ আগে আগে পালিয়ে যাচ্ছে দেখে তার হাঁটুর পিছনে গুলি করল। কাতরে উঠে আছড়ে পড়ল লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক কষল চাপ দাড়ি ও জলহস্তী।

'নড়বে না!' হুঙ্কার ছাড়ল রানা। 'এক পা নড়লে...' হুমকিটা শেষ করল না ও।

ঘুরে দাঁড়াল লোক দুটো, ভয়ে ও উত্তেজনায় ভোঁশ-ভোঁশ করে হাঁপাচ্ছে। শেষেরজন দরদর করে ঘামছে। ওদিকে রক্তে লাল হয়ে উঠেছে কেরামতুল্লাহ্র পাজামা, চেহারা বিকৃত করে দু'হাতে রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করছে মরিয়া হয়ে। এ রুম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার দরজার কাছে নড়াচড়া দেখে পরপর দুটো গুলি করল রানা।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কানের পর্দা ফাটানো মরণ চিৎকার দিয়ে উঠল কেউ। পায়ের শব্দ শুনে ঘুরল রানা। আরেক দরজা দিয়ে ঘুরে ঢুকছে বালব্ আনতে যাওয়া সেই খাদেম। রানাকে অস্ত্রহাতে দেখে ঝট্ করে পিস্তল বের করল সে। গুলি করল রানা। ক্লিক্ করে শূন্য চেম্বারে পড়ল হ্যামার। গুলি শেষ। তারমানে পাঁচটা গুলিই ছিল সর্বসাকুল্যে। স্লাইড টেনে দেখল পিস্তল খালি।

হেসে উঠল খাদেম। 'এইবার!'

দম বন্ধ করে লাফ দেয়ার জন্যে তৈরি হলো রানা, কিন্তু তার দরকার হলো না। আরেকটা গুলির সঙ্গে সঙ্গে কপালের মাঝখানে তৃতীয় চোখ গজাল খাদেমের। বুলেটের ধাক্কায় খাড়া অবস্থায় উল্টে পড়ল সে, ঠোশ করে ভাঙল বালবটা মেঝেতে পড়ে। অবাক হয়ে ঘুরে তাকাল রানা। দেখল গিল্টি মিয়া ট্র্যাপ ডোরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে আরেক ম্যাকারভ হাতে। মুখে সরল, নিষ্পাপ হাসি।

মালাইচাকি গুঁড়ো হওয়া দ্বিতীয় খাদেমের অস্ত্রটা নিয়ে বেরিয়ে আসছিল, পলকে পরিস্থিতি বুঝে নিয়ে গুলি করেছে। গিলটি মিয়াকে ধন্যবাদ জানানোর জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিল রানা, এমন সময় বাইরে অনেক জোড়া ভারী পায়ের দৌড়াদৌড়ি, চিৎকার ও কয়েকটা গুলির শব্দ উঠতে থেমে গেল।

'সারেন্ডার! সারেন্ডার!' মোটা একটা কণ্ঠের হাঁক ভেসে এলো বাইরে থেকে। 'কেউ পালাবার চেষ্টা করবে না। তাহলে গুলি করা হবে।'

কিছুক্ষণ ধুপ! ধাপ্! 'ধর শালাকে!' অথবা, 'মাগো!' 'বাবারে!' শোনা গেল।

তারপর সব চুপ।

একটু পর সোহেলের হাঁক শোনা গেল বাইরে থেকে। 'রানা! তুই কোথায়?'

'এদিকে, সোহেল! ভেতরে!'

কয়েক মুহূর্ত পর হন্তদন্ত হয়ে ঢুকল সোহেল ও আরও কয়েকজন। হাঁটু পর্যন্ত কাদাপানিতে মাখামাখি সবার।

রানাকে দেখে হাঁফ ছাড়ল সোহেল, পরক্ষণে মাথা নেড়ে হতাশা প্রকাশ করল। 'পারলাম না রে! আসলটাই পালিয়ে গেল।'

'খায়রুল কবীর?' রানা বলল।

'হ্যাঁ। অন্ধকারে ঠিকমত বুঝে ওঠার আগেই…'

'যাক্‌গে,' রানা সান্ত্বনা দিল ওকে। 'যা হওয়ার হয়েছে। এগুলো তো আছে!' ইঙ্গিতে অন্যদের দেখাল।

কেরামতুল্লাহ্‌ ও তার সঙ্গীদের ওপর চোখ বোলাল সোহেল। তারপর আফসোস প্রকাশের ভঙ্গিতে বলল, 'দেশ ও জাতির এতসব মান্যিগণ্যি হোমরাচোমরার এই দশা?'

মুচকে হাসল রানা।

'আমার প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ধন্যবাদ, গিল্টি মিয়া,' ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল ও।

লজ্জা পেয়ে গেল ছোটখাট মানুষটা। বিনয়ে গলে গেল। 'আমি আর কি করলুম, সার! কতায় বলে না, রাকে আল্লা মারে কে?' পরক্ষণে ঘরের সবার ওপর নজর বুলিয়ে সিরিয়াস হয়ে উঠল। 'হায়, হায়, সার! চৌদ্রীর ব্যাটাকে তো দেকচিনে! সে কোতায়…'

'ও পালিয়ে গেছে,' সোহেল বলল। 'অল্পের জন্যে ধরতে পারলাম না হারামজাদাকে। বাধা দিতে গিয়ে আমাদের একজন তার গাড়ির ধাক্কায় মারাত্মক জখম হয়েছে।'

'যাহ্‌, আসলটাই ভাগলওয়া?' বলল গিল্টি মিয়া।

'খায়রুল কবীর আসল না,' রানা মাথা নাড়ল। পিস্তল দুলিয়ে সামনের চারজনকে দেখাল। 'আসল এরা। ঘরের শত্রু বিভীষণ, দু'মুখো সাপ। এদের জন্যে আবার বাংলাদেশে পা রাখার সুযোগ পেয়েছিল ও। এদেরকে যদি আজ ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে একদিন হয়তো আবারও আসবে। সেবার হয়তো সময়মত ঠেকানো যাবে না।'

কেরামতুল্লাহ্‌র উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল ও। 'কেমন বুঝছ, কাঠমোল্লা? ভেবেছিলে কোথায় এনেছ আমাকে তা কাকপক্ষীও টের পায়নি, কাজেই ভয়ের কিছুই নেই। ইতির মা-বাবাকে তুলে আনতে ব্যর্থ হয়ে যেদিন তোমার অ্যাম্বুলেন্স পালিয়ে আসে, সেদিন থেকেই এই জায়গার খবর জানা ছিল আমাদের।'

'ওটাকে ফলো করা হয়েছিল!' প্রশ্ন নয়, মন্তব্য করার ভঙ্গিতে বলল লোকটা।

'অবশ্যই ফলো করা হয়েছিল। যখন জানলাম, এসবের মধ্যে খায়রুল কবীরও আছে, তখনই ঠিক করেছিলাম কায়দা করে তোমাদের পালের সবক'টাকে এখানে এনে গলায় দড়ি পরাব। অবশ্য ওই লোক যে আজই আসবে,

সে কথা জানতাম না।'

'আফসোস!' সোহেল বলল। 'ধরতে পারলাম না ব্যাটাকে।'

'ওটাকে না হয় না-ই পেলাম,' বলল রানা। 'এগুলোকে তো পেয়েছি!'

'কিন্তু তাতে তোমার কোন লাভ হবে না, মাসুদ রানা,' কেরামতুল্লাহ্ বলল দৃঢ় গলায়। 'আমাদেরকে আটকে রাখার ক্ষমতা তোমার মত চুনোপুঁটিদের নেই।'

'হ্যাঁ,' সায় দিল চাপ দাড়ি। এই প্রথম মুখ খুলল লোকটা। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে নিজেকে ফিরে পেয়েছে। 'আমাদের ক্ষমতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই আপনার।'

'আছে,' বলল ও। 'আছে বলেই তোমাদেরকে ভয় পাই আমি।'

হেসে উঠল কেরামতুল্লাহ্। 'বুঝুন তাহলে কাদের সাথে লাগতে এসেছেন। কোন প্রমাণ ছাড়া আমাদের বিরুদ্ধে একটা আঙুলও তুলতে পারবেন না আপনি। কোন অভিযোগ হালে পানি পাবে না কোর্টে। কাল এগারোটার মধ্যেই কোর্ট থেকে সসম্মানে ছাড়া পেয়ে যাব আমরা।'

চোখ গরম করে লোকগুলোকে দেখল সোহেল। 'শা-লা, হারামখোর, হারামির বাচ্চা! প্রেমের আলাপ হচ্ছে?' মাথা ঝাঁকাল কেরামতুল্লাহ্‌র উদ্দেশে। 'বাঁশডলা কাকে বলে জানিস? একবার খেলে বাপ-দাদা চোদ্দ গুষ্টির নাম ভুলে যাবি। প্রমাণ তখন নিজেই সেধে আমাদের হাতে তুলে দিবি, শা-লা!'

'গিল্টি মিয়া,' রানা বলল। 'কিছু দড়ি জোগাড় করো দেখি।'

দড়ির খোঁজে গিলটি মিয়া টর্চার চেম্বারে গিয়ে ঢুকতে সোহেলের দিকে ফিরল। 'শেয়ালের ডাক তো অনেক আগেই শুনেছি। তারপরও এত দেরি হলো যে?'

'আর বলিসনে। একে অন্ধকার, তারওপর কাদা-পানি, গর্ত-ডোবা। এই সামান্য পথ, ফুরোতেই চায় না।'

'কতজন আছে তোর সাথে?'

'আটজন। কেন?' বলল ও।

'ধরেছিস্ ক'টাকে?'

'কুড়িজনের মত। ব্যারাকে ঘুমাচ্ছিল।'

গিল্টি মিয়া দড়ি নিয়ে আসতেই সবকটাকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল রানা শক্ত করে। কেরামতুল্লাহকে বাঁধার আগে তার ক্ষতস্থানটাও কষে বাঁধল, রক্ত পড়া কিছুটা কমল এর ফলে।

'অ্যাহ্!' নকল বিরক্তির সঙ্গে বলল সোহেল। 'এ কি করেছিস, দোস্ত? গরুচোরের মত বেঁধেছিস কেন এদের? কোথায় নিয়ে যেতে চাস?'

'কোথায় আবার! লাল দালানে।'

কেরামতুল্লাহর মুখে এরমধ্যেও হাসি ফুটল ওর জবাব শুনে। সঙ্গীদের দিকে ফিরে হাসল সে মুখ টিপে।

'হেসো না,' ধমক লাগাল রানা। 'তোমাদের বিরুদ্ধে অফিশিয়াল কোন চার্জ হবে না আপাতত। বিনা অভিযোগেই জেলের ভাত খাবে কিছুদিন।'

গাঢ় সন্দেহ ফুটল মাওলানার চেহারায়। 'তার মানে?'

'তুমি তখন বললে না কোর্টে চালান দিলে এক ঘণ্টার মধ্যে বেরিয়ে আসবে তোমরা? তাই কোর্টে যাতে যেতে না হয়, সেই ব্যবস্থা করছি।'

'পাগল নাকি? আমার উকিল যখন খবর পাবে...'

'কি করে পাবে?' রানা বলল। 'কে জানছে তোমরা কোথায় আছ? রাত থাকতে থাকতে নিয়ে ভেতরে পুরে দেব। কেউ দেখবে না।'

একটা ঢোক গিলল কেরামতুল্লাহ। এবার সত্যি সত্যি ভয় পেয়েছে। দুর্বল গলায় বলল, 'দেশে এমন কোন আইন নেই যে...'

'আছে,' বাধা দিল সোহেল। 'আমাদের সার্ভিসের একটা পকেট আইন আছে। তোমরা জানো না। ওতে এ সম্পর্কে বিশদ ও বিস্তারিত লেখা আছে।'

গরুর পালের মত খেদিয়ে লোকগুলোকে গ্যারেজে রাখা মাইক্রোবাসটায় তোলা হলো। তারপর বাঁধা হলো তাদের পা। ভাঙাচোরা ভঙ্গিতে পড়ে থাকল তারা। রানা উঠে বসল ড্রাইভিং সীটে, সোহেল ওর পাশে। গিল্টি মিয়া গিয়ে সোহেল বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিল। দুটো মাইক্রোবাস করে এসেছিল ওরা। তিনটেই একসাথে রওনা হলো ঢাকার দিকে।

ইঁট বিছানো এবড়োখেবড়ো প্রাইভেট রাস্তা ধরে তুমুল গতিতে গাড়ি ছোটাল রানা। নামেই ইঁট বিছানো রাস্তা ওটা, ইঁট কয়টা আছে হাতে গোনা যায়। ঘন ঘন ঝাঁপ দিচ্ছে গাড়ি, বৃষ্টির পানি ছিটাচ্ছে। অনেক পিছনে পড়ে গেল অন্য গাড়ি দুটো। একটু পর আর ওগুলোর আলো দেখা গেল না।

পিছনে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসল সোহেল। 'মরেছে! এত আছাড়ে হেগেমুতে না মরে ব্যাটারা।'

মুচকে হাসল রানা। কিছু বলল না। বড় রাস্তায় উঠে আরও জোরে ছোটাল গাড়ি। ফাঁকা রাস্তায় তুমুল বেগে চালিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে বনানী রেল ক্রসিঙের কাছে পৌঁছে গেল। সামনে লাল সিগন্যাল জ্বলছে, অথচ গেট খোলা, কাজেই স্পীড ব্রেকার পেরিয়ে এলো ও। গিয়ার দিল, বিচ্ছিরি আওয়াজ করে উঠল এঞ্জিন। কাজ হচ্ছে না। গড়িয়ে এসে ঠিক রেল লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে পড়েছে গাড়ি। আঁতকে উঠে স্টিক ধরে মরিয়া টানাহ্যাঁচড়া শুরু করল ও।

'কি হলো?' সোহেল বলল।

'গিয়ার বক্স,' বলল ও দাঁতে দাঁত চেপে। 'মনে হয়...' আর কিছু বলার সুযোগ পেল না। মাথায় ভারী কিছুর আঘাতে জ্ঞান হারিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল স্টিয়ারিং হুইলের ওপর।

'একি!' চমকে পেছনে তাকাল সোহেল। যা দেখল তাতে আঁতকে উঠল। কুদরতুল্লাহ কি করে যেন হাতের বাঁধন খুলে ফেলেছে। সীটের তলা থেকে একটা ভারী রেঞ্চ তুলে নিয়ে আক্রমণ করে বসেছে রানাকে। চোখাচোখি হতে লোকটার দু'চোখ জ্বলে উঠতে দেখল সোহেল। একই মুহূর্তে ওর মাথা সই করে রেঞ্চটা চালাল কুদরতুল্লাহ। ঝাঁকি মেরে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে ধাঁই করে লোকটার নাকে ঘুসি চালাল সোহেল।

রেঞ্চ ছেড়ে দিয়ে অন্যদের গায়ের ওপর আছড়ে পড়ল সে। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল কেউ একজন। লোকটার পড়ার ভঙ্গি দেখেই বোঝা গেল, পা এখনও বাঁধা

তার। পিস্তল বের করতে যাচ্ছিল সোহেল, এমন সময় কাছেই ট্রেনের হুইসেল শুনে চমকে গেল। সন্ত্রস্ত চোখে বাঁয়ে তাকাল, দেখল তীব্র আলোয় ভরে উঠেছে চারদিক। এসে পড়েছে ট্রেন।

'রানা! রানা!' ব্যস্ত হয়ে ডাকল সোহেল, ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে লাগল। কাজ হচ্ছে না। ভয়ে ঘাম ছুটে গেল ওর। পিস্তলের কথা ভুলে এক ঝটকায় নেমে পড়ল। দৌড়ে এসে রানার দিকের দরজা খুলে ওকে নামানোর জন্যে এক হাতে গায়ের জোরে টানাহ্যাঁচড়া শুরু করল। ওরই ফাঁকে ঘন ঘন ঘুরে তাকাচ্ছে ট্রেনের দিকে। ঝড়ের গতিতে আসছে ওটা। আর বড়জোর কয়েকশো ফুট দূরে আছে। একটা বাঁক আছে সামনে, ওটা ঘুরলেই শেষ।

এমনসময় গেটম্যানের দেখা পাওয়া গেল। গেটের সাথের ছোট্ট কোয়ার্টার থেকে চোখ ডলতে ডলতে বেরিয়ে আসছে। সামনের দৃশ্য দেখে মুহূর্তের জন্যে পাথর হয়ে গেল বয়স্ক লোকটা, তারপর চকিতে একবার ট্রেনটা দেখে নিয়ে দিশেহারার মত হৈ-হৈ করে ছুটে এলো গাড়িটার দিকে। সোহেল ততক্ষণে অনেক কষ্টে বের করে এনেছে অজ্ঞান রানাকে, পিছন থেকে এক হাতে ওর বুক পেঁচিয়ে ধরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে লাইনের কাছ থেকে। পরিশ্রমে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে ওর।

'গাড়িতে মানুষ আছে!' ওরই মধ্যে কোনমতে চেঁচিয়ে বলল লোকটার উদ্দেশে। 'ওদের বের করুন! ট্রেন থামান!'

সময় নেই জেনেও চেষ্টার কোন ত্রুটি করল না গেটম্যান। আর কিছু না পেয়ে কাঁধের গামছা তুলে পাগলের মত নাড়তে লাগল সে। রানাকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে এনে সোহেলও মরিয়া হয়ে হাত নাড়তে লাগল। ট্রেনের ড্রাইভার একেবারে শেষ মুহূর্তে খেয়াল করল ব্যাপারটা। তুমুল গতিতে বাঁক ঘোরা শেষ করেছে তখন ট্রেন। এক চোখা দানবের মত হাঁ-হাঁ করে ছুটে আসছে।

একেবারে শেষ মুহূর্তে অসহায়ের মত মাইক্রোবাসটার দিকে তাকাল সোহেল। ভেতরে উন্মত্তের মত চিৎকার করে কাঁদছে লোকগুলো। কারও বুঝতে বাকি নেই কি ঘটতে যাচ্ছে। কুদরতুল্লাহকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দরজা খোলার প্রাণপণ চেষ্টা করতে দেখল ও, কিন্তু অন্য তিনজনের পাগলের মত লাফালাফির কারণে ব্যর্থ হলো সে। এসে পড়ল ট্রেন।

মাইক্রোবাসের সাথে ওটার সংঘর্ষে কেঁপে উঠল গোটা এলাকা, চোখের পলকে দু'ভাগ হয়ে ছিট্‌কে শূন্যে উঠে পড়ল গাড়িটা। দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। ছিন্নভিন্ন গাড়ির ছোট ছোট টুকরো রাস্তায় পড়ে ধাতব শব্দ তুলে ড্রপ্ খেয়ে দিগ্বিদিক ছুটে গেল। দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল সব। লোহার সাথে লোহার তীক্ষ্ণ ঘর্ষণের শব্দে ঘুরে তাকাল রানা।

ট্রেন থেমে দাঁড়াতে শুরু করেছে। ব্রেক কষার ফলে ফুলঝুরির মত ফুলকি উঠছে লাইন থেকে।

ভোরের আলো ঠিকমত ফোটার খানিক আগের ঘটনা। বোমা বর্ষণের ভয়াবহ শব্দে কেঁপে উঠল বাংলাদেশ-মায়ানমার বর্ডারের একটা অঞ্চল। মুহুর্মুহুঃ বোমা

পড়ছে প্রতিবেশী দেশটির পলেতওয়ার বিশেষ এক দুর্গম পাহাড়ী এলাকায়। অস্ত্রের ডিপো বিস্ফোরিত না হওয়া পর্যন্ত চলল বম্বিং।

ও দেশের সামরিক কর্তৃপক্ষ ঠিকমত কিছু বুঝে ওঠার আগেই ধুলোয় মিশে গেল সেখানকার বিশেষ একটা স্থাপনা ও কিছু বিশেষ মানুষ। এক স্কোয়াড্রন অজ্ঞাত হানাদার বিমান কাজ সেরে যখন ফিরে গেল, তখন অর্ধেক হয়ে গেছে ওখানকার জনসংখ্যা।

ওদিকে বঙ্গোপসাগরের আন্তর্জাতিক পানিসীমায় অপেক্ষায় ছিল একটা অজ্ঞাত সাবমেরিন। সমস্যা টের পেয়ে কেবল জায়গা বদল করল ওটা। কেটে পড়ার কোন আগ্রহ দেখাল না। ওইদিনই অবশ্য গভীর রাতে বিশেষ মেসেজ পেয়ে অজানা গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল ওটা সবার অজান্তে।

এদিকে, সকালের দিকে চট্টগ্রাম বন্দরে মাল খালাসের জন্যে প্রস্তুত এক বিদেশী মালবাহী জাহাজে অভিযান চালাল এক বিশেষ বাহিনী। একটা হোল্ডে করে আসা একগাদা 'খুচরা যন্ত্রাংশ' জব্দ করল তারা উপযুক্ত কাগজপত্র নেই বলে।

ওগুলোর মালিকানা দাবী করতে এলো না কেউ।

***